২৬০

সাক্ষরতা বুলেটিন

মাঘ ১৪২২
জানুয়ারি ২০১৬

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৬০ মাঘ ১৪২২ জানুয়ারি ২০১৬

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ
প্রকাশিত রচনাসমূহের
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
মতামত সম্পূর্ণত
লেখকের,
গণসাক্ষরতা অভিযান
কর্তৃপক্ষের নয়।

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

সূ চি প ত্র

৩ **শফি আহমেদ**
বর্ষশুরুর ভাবনা এবং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা

৬ **আ. ন. স হাবীবুর রহমান**
গ্রামীণ শিক্ষার বিবর্তন ও জনগণের আকাঙ্ক্ষা

৯ **আইনুন নাহার বেগম**
বাংলাদেশে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার বিবর্তন

১৩ **মুহম্মদ হাসান খালেদ**
বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যস্ত কৃষি ব্যবস্থাপনা

১৬ **মো. রহমত উল্লাহ্**
কওমি মাদ্রাসায় যুক্ত করতে হবে কর্মমুখী ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা

১৯ **মোঃ ইয়াসিন আরাফাত**
শিক্ষক প্রশিক্ষণ কতটুকু কার্যকর হচ্ছে?

২২ **এ এ ম রাশিদুজ্জামান খান**
তাঁর তরে একটি সাজানো বাগান চাই

২৪ **বিশেষ প্রতিবেদন**
সবার জন্য শিক্ষার নিশ্চয়তা চাই
চাই শিশুদের স্কুলে ভর্তি এবং শিক্ষা সমাপনে
সকলের অংশগ্রহণ

২৭ **তথ্যকণিকা**

২৯ **সংবাদ**

শ ফি আ হ মে দ

বর্ষশুরুর ভাবনা এবং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা

আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে অনাদি যোগ বাংলা নববর্ষের। বাংলা বর্ষরাম্ভের ওই দিনটা আমরা রঙে আর আনন্দে মিলনের উৎসবে মাতিয়ে তুলি। কিন্তু প্রায় দুই শ' বছরের বিদেশী ইংরেজি শাসনামলের যে চিহ্নটা আমাদের জীবনে সর্বাধিক ব্যাপকভাবে ও নিত্যদিনের কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে আছে, সে হল দিনযাপনের জন্য খ্রিষ্ট্রিয় গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জির ব্যবহার। আমরা যারা নববর্ষ, মানে বাংলা নববর্ষ উদযাপনে আনন্দের নানা সম্মিলনীর সংগঠক, তাদের নিন্দা করার একটা মোক্ষম অস্ত্র ব্যবহার করে থাকেন পরিচিতজনসহ বিরোধী নানান শিবির। হঠাৎ করেই, হয়তো জুলাই মাসের কোন একদিন জিজ্ঞেস করে বসলো, 'বলো তো আজ বাংলা সনের কত তারিখ?' আমাদের জীবনের সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিকতায় খ্রিষ্টিয় সালের হিসেব-নিকেশ এবং অনুসরণ এমন এক আধিপত্য বিস্তার করে আছে যে, এমন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাই। যদি হাতের কাছে দৈনিক সংবাদপত্রটা থাকে, সেটার সাহায্য নিতে হয় তখন। লজ্জার কথা হলেও এটাই বাস্তবতা।

বছরের মাঝামাঝি আর একটা খুব কেজো এবং আনুষ্ঠানিক বর্ষশুরুর রীতি আছে। সেটা নিয়ে সামাজিকভাবে আমরা তেমন সোরগোল করি না, যতটা করি পহেলা বৈশাখের সকাল থেকে রাত অবধি অথবা খ্রিষ্টিয় বর্ষরাম্ভের শূন্য ঘন্টায় অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর মাঝরাতে। অথচ ওই কাগুজে আলাদা একটা বর্ষের হিসেবই সামগ্রিক অর্থে আমাদের জীবনের বাস্তবিক নিয়ন্তা। এটাকে আমরা বলি অর্থ বছর। সত্যিই আমাদের সংসারধর্মের গতিপ্রকৃতিকে অর্থবহভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এই পয়লা জুলাই থেকে তিরিশে জুনের বছরের হিসেব। মে মাস থেকেই সামাজিক গুঞ্জন শোনা যায়, এবারের বাজেটে এই জিনিসটার দাম বাড়বে বা কোনো কোনোটির দাম কমে যাবার সম্ভাবনা বিষয়ে। মধ্যবিত্ত একটু যাচাই বাছাই করে হয়ত গাড়ি অথবা দামী কোন ইলেকট্রনিক পণ্য আগেই কিনে রাখেন; ধুরন্ধর ব্যবসায়ী টাকার জাল ফেলে কোনো কোনো দ্রব্য মজুদ করে ফেলেন। কোন দ্রব্যের কতটা কর বাড়া/কমার সম্ভাবনা এবং আয়কর প্রদানের সীমাটা বাড়ছে কি না এসব নিয়ে চিন্তার কিছুটা ভার থাকলেও অর্থ বছরের হিসেব আমাদের জীবনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে না।

কিন্তু খ্রিষ্ট্রিয় নববর্ষ বা জানুয়ারির ভিত্তিতে অথবা সারা বছরটার সঙ্গে আমাদের যে অবিচ্ছেদ্য যোগ, তার সঙ্গে অন্যকিছুর তুলনা চলে না। ছোটবেলার স্মৃতি থেকেই সেই যোগকে আলাদা করে চিনে নেয়া যায়। বৈশাখের হালখাতার হিসেব যেমনই হোক না, অথবা সংসার খরচের হিসেবটার যতই

সংস্কারের প্রয়োজন হোক না কেন, জানুয়ারী মাস মানে নতুন ক্লাসে ওঠার, স্কুলের নতুন কক্ষে পাঠগ্রহণের এবং নতুন বইয়ের অনির্বচনীয় ঘ্রাণের স্বাদ। এই রীতিটার সঙ্গে জীবনের অন্যান্য অনুষঙ্গের অন্য বৈশিষ্ট্যকে মেলানো যাবে না।

দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার চরিত্রটা বিবেচনায় নিলে বোধ করি এই ভুবনটার সঙ্গে খ্রিষ্টিয় নববর্ষের আবাহনের যোগটা যতটা গভীর ও নিবিড়, তেমন করে আর কোন কিছুকেই শনাক্ত করা যাবে না। বাস্তবতার নিরিখে অতি সম্প্রতি স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যদিবা, কিন্তু এই বছর দুয়েক আগেও জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ মানে হল, শিশুকে ভর্তির জন্য বিভিন্ন নামকরা স্কুলের অফিস, প্রাঙ্গণ অথবা দেয়ালের বাইরে লাখো অভিভাবকদের চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ উপস্থিতি। স্কুলের প্রধানের সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্বিগ্ন অভিভাবকের কী গভীর আকুতি। ফরম পূরণ করতে যেন ভুল না হয়, তার প্রতিকারে আগেই ওই ফরমের ফটোকপি করা, পূরণ করার পর আবার ফটোকপি। ভর্তিযোগ্য শিশুদের সকল পরিবারে তখন প্রায় খুব অস্থির অবস্থা। স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য কত রকমের কৌশল গ্রহণ।

ভর্তি পরীক্ষার দিন নামী-দামী স্কুলের সামনে যে ধরনের ভিড়ের ছবি সংবাদপত্রে বা টেলিভিশনের পর্দায় দেখা গেছে, তার সঙ্গে শুধু আন্তর্জাতিক পর্যায়ের দুই প্রধান যুযুধান দলের ক্রিকেট খেলার টিকিট পাওয়ার চেষ্টা অথবা বম্বে থেকে উড়ে আসা কোন নায়ক-নায়িকার মুখদর্শনের আকাঙ্ক্ষিত প্রতীক্ষায় দর্শকদের ভিড়ের তুলনা করা চলে। এই স্মৃতি কিন্তু একেবারেই নিকট অতীতের।

এই যে, নতুন বছর এল, যার সঙ্গে প্রধানত আমাদের স্কুল শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গাঙ্গী যোগ, সেই আগমনীতে আমাদের সাধারণ প্রত্যাশা এবং তা পূরণের ক্ষেত্রে অগ্রগতির খোঁজখবর নেয়া যেতে পারে। প্রথমেই মনে পড়ে, ২০১০ সালে গৃহীত আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ঘোষিত লক্ষ্যের কথা। তার বাস্তবায়নে আমরা কি কি পদক্ষেপ আশা করেছি এ বছর। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের যে পদক্ষেপটার কোনই উদ্যোগ লক্ষ করা যাচ্ছে না, তা হল, প্রাথমিক স্তরকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত করা। শিক্ষানীতিতে এ বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ প্রথম থেকেই বহুজনের মধ্যে নানা প্রশ্ন ও সংশয়ের জন্ম দিয়েছিল। কিছু ব্যক্তির কাছে বিষয়টা বাহুল্য, কারো কারো কাছে অপ্রয়োজনীয়, বাস্তবতাবর্জিত ও দিক-নির্দেশনাহীন মনে হয়েছিল। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এগিয়ে নেবার সুপারিশ কিন্তু একেবারে আনকোরা নতুন বা বৈপ্লবিক কোন বিষয় ছিল না। দেশ স্বাধীন হবার পর পরই গঠিত কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনেও একই ধরনের সুপারিশ করা হয়েছিল। যাই হোক, ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সালে এসে পৌঁছেছি আমরা। এমন একটি ব্যবস্থার বাস্তবায়ন যে রাতারাতি বা কোন সরকারি নির্দেশনার মাধ্যমে অবিলম্বে ঘটে যাবে, এমন কথা আমরা কেউ ভাবিনি। কিন্তু যা প্রত্যাশা করেছিলাম এবং এখনো করছি তা হল, সরকার এ বিষয়ে একটা সুচিন্তিত, সুনির্দিষ্ট ও যৌক্তিকভাবে কর্মে রূপায়ণযোগ্য বাস্তবায়ন পদ্ধতি বা কর্মপরিকল্পনা পেশ করবেন।

কিন্তু অদ্যাবধি তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে বর্তমানে শিক্ষাদানকারী শিক্ষকদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন অস্পষ্ট ধারণাও নেই, তাঁরা অথবা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দের মধ্যে এই পরিবর্তন বা উন্নয়ন বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। অথচ মাঝখান থেকে কালের হিসেবে পাঁচটা বছর পার হয়ে এসেছি আমরা।

শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন কমিটি নামে আলাদা একটা সংঘ তৈরি করা হয়েছে। কেন যে তা করতে হল, তার পক্ষে কোন শক্ত যুক্তি নিশ্চয়ই দেয়া যাবে না। এই কমিটির যারা সদস্য, তারা কেউই ক্ষমতাবান ব্যক্তি নন, সভা আহবান অথবা সেই সভার সিদ্ধান্ত যথাযথ স্থানে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে আবশ্যিকভাবেই মন্ত্রণালয়ের আমলাদের শরণাপন্ন হতে হয়। অতএব কমিটির কার্যকারিতা কতটুকু তা বোধগম্য নয়। আমাদের জন্য এমন সান্ত্বনা সত্যিই পরম পরিহাসময় বলে মনে হয়। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের উর্ধ্বসীমা বৃদ্ধির কথা আমরা ভুলে যেতে বসেছি।

এমন কথা শোনা গিয়েছিল, প্রতি বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে একটা করে কক্ষ বাড়বে এবং যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে পঞ্চম থেকে পরবর্তী শ্রেণী পর্যন্ত আসন বিন্যাসের নতুন ব্যবস্থা করা হবে। এ ব্যাপারে কোন ধরনের উদ্যোগ চোখে পড়েনি আমাদের। প্রতি বছর পি-এস-সি এবং জে-এস-সি পরীক্ষা গ্রহণের সব প্রস্তুতি চলছে, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষা নিয়ে আমরা যারা খোঁজ-খবর রাখি, তাদের কাছে কোন সংবাদ বা সংকেত নেই যে, কিভাবে, বিভিন্ন পর্যায়ে বর্তমানের এই প্রাথমিক স্তরকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে। অথচ বর্তমান লেখকও ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হওয়ার পর ঢাক-বাদ্যি বাজিয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেছিল, বাংলাদেশের নানা প্রান্তে ঘুরে ঘুরে এই শিক্ষানীতির সপক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিল। ২০১৬ সালের জানুয়ারী মাসে বর্ষারম্ভে আমার বৃহত্তম হতাশার এলাকা

হল, এখন পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরকে অষ্টম শ্রেণীতে বিস্তৃত করার কোন কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। পরিস্থিতি বিচারে মনে হচ্ছে, যদি বেঁচে থাকি, আগামী ২০১৭ সালেও আমার হতাশার কোন মোচন ঘটবে না।

হতাশা ও ক্ষোভের এখানেই শেষ নয় এই জানুয়ারিতে। বিগত তিন বছরে বিভিন্ন সভা ও সেমিনারে শুনতে পাচ্ছি, জাতীয় পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাক্রম বোর্ডের কর্তাব্যক্তিরা বার বার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, আগামী জানুয়ারিতে (সেটা আরম্ভ হয়েছে ২০১৪ সাল থেকে) আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার পথ সুগম করতে পাঁচটি নৃতাত্ত্বিক ভাষায় প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক আগে সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত এ ধরনের দু'টি সভায় যোগদান করেছিলাম। এজন্য প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে, আনুষ্ঠানিকভাবে যা যা হবার তার সবই হয়েছে, শুধু কাজের কাজটি হয়নি। ওই সব বই ছাপা হয়নি, ওইসব বই আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিশুদের হাতে পৌঁছায়নি। এ বিষয়ে সরকার যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন বিভিন্ন বিরতিতে তার সবটাই শুনেছি, অসহায়ভাবে বিশ্বাসও করেছি।

কিন্তু এখন যেন কেন মনে হয়, কোথাও কি কেউ কলকাঠি নাড়ছে। এর সঙ্গে যুক্ত বেশির ভাগ ব্যক্তিই আমলাতন্ত্রের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখাচ্ছেন। আমার নিজের মনে হয়েছে, অন্তত বিভিন্ন সভায় শক্তিধর মন্ত্রীদের কথা শুনে মনে হয়েছে, এ বিষয়ে সরকারের আন্তরিকতার ঘাটতি নেই। তা হলে বইগুলো এখনো প্রকাশিত হচ্ছে না কেন?

আদিবাসী অবস্থান এবং অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন সভায় বার বার দাবি জানানো হয়, সরকার প্রায় দেড় শতকেরও বেশি সময় আগে স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তিচুক্তির অনেকাংশ অদ্যাবধি বাস্তবায়ন করছে না। এমন সব সভাতেও একথা উঠেছে যে, আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় রচিত পাঠ্যবই প্রকাশনার কথা থাকলেও সে কাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি। তা হলে কোন মহল, কোথাও কি অদৃশ্যভাবে ঘাপটি মেরে আছে, যারা সরকারের সঙ্গে আদিবাসীদের দূরত্ব বহাল রাখতে তৎপর? ২০১৬ সালের জানুয়ারিতেও আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় পাঠ্যবই ছাপা হল না, এই দুঃখজনক অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি কি আগামী বছরেও ঘটবে? কে জানে!

এই লেখায় শুধু আমার দুঃখ ও বেদনার কথাই বলতে চাইছি না। প্রতি পয়লা জানুয়ারিতে দেশের সব শিশু শিক্ষার্থীর হাতে যে নতুন বই তুলে দেয়া হচ্ছে, সেই দেশব্যাপী জাতীয় আনন্দ উৎসবের অংশীদার আমিও। আমার আগের একাধিক লেখায় সরকারকে এ বিষয়ে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানিয়েছি। জানুয়ারীর এক তারিখে টেলিভিশনের পর্দায় লাখো শিশুদের যে সহাস্য ছবি দেখি, তা দেখে বুক ভরে যায়। শিক্ষামন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, সরকার এবং এন-সি-টি-বিকে এজন্য গভীর অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিশেষভাবে স্মরণ করছি ২০১৪ এবং ২০১৫ সালের পয়লা জানুয়ারির কথা। দেশের অমন হিংসা-বিহ্বল, বিধ্বস্ত সময়েও ঠিক ওই এক তারিখেই সব বাধা-বিপত্তি পেরিয়েও বান্দরবান বা কুড়িগ্রামের প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের স্কুলগুলোতে ঠিকই বই সরবরাহ করা হয়েছে। আমাদের যে কোন জাতীয় উদ্যোগে এমন সফলতা সত্যিই বিরল ও বিস্ময়কর। দেশের সর্বত্র অস্থিরতার কারণে ওই দুই বছরে শিক্ষার্থীদের সঠিক সময়ে বই পাওয়া নিয়ে যেমন শঙ্কিত ছিলাম, এবারও প্রায় একইভাবে উদ্বিগ্ন ছিলাম আমরা। বই মুদ্রণের টেণ্ডার নিয়ে প্রথম থেকেই নানান নাটকের কথা গণমাধ্যম থেকে আমরা জেনেছি। এমনকি ২০১৫ সালের নভেম্বরেও এমন খবর দেখেছি, যাতে আতঙ্কটা বেড়েছে। কিন্তু বই বিতরণের সরকারি কার্যক্রমে সফলতার কোন হানি হয়নি। এই এত বড় চ্যালেঞ্জ যে সরকার গ্রহণ করতে পারে, তাদের সেই জেদ আরও কিছু বিষয়ে প্রতিফলিত হলে তো দেশের শিক্ষাব্যবস্থার চালচিত্রে আরো গতিশীল ও ইতিবাচক মাত্রা যুক্ত হতে পারে।

বই হাতে পাবার আনন্দ উপভোগ করার কয়েকদিন পর থেকেই আবার কিছু অনুযোগ শোনা যায়। মুদ্রণের ত্রুটি থেকে গেছে, তথ্য সঠিক নেই, বিষয় বিন্যাস তেমন শিক্ষার্থী-বান্ধব হয়নি। আমরা যারা এসব বিষয়ে আমাদের পর্যবেক্ষণ জানিয়েছি, এন-সি-টি-বি তার কিছুটা গ্রহণ করলেও দেশব্যাপী বিতরণ ব্যবস্থা ইত্যাদি করতে যে শ্রম দেয়া হয়, বইয়ের ভেতরের বিষয়বস্তু নির্মাণে তার ছাপ নেই। সম্পাদনায় যাদের নাম থাকে, তারা কতটা সময় পান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার জন্য? সম্পাদকদের যোগ্যতা কি প্রশ্ননিরপেক্ষ? এসব মূল বিষয়ের প্রতি নজর দিয়ে ২০১৭ সালে একই ধরনের অনেক কাজের চাপ সইতে হবে এন-সি-টি-বি-কে। কিন্তু তার পরের বছর অর্থাৎ ২০১৮ সালে বইতে কি বিষয়বস্তু থাকবে, কিভাবে তা পরিবেশিত হবে, কারা এর প্রণয়ন ও সম্পাদনার দায়িত্ব সঠিক ও আন্তরিকভাবে পালন করতে পারবেন, সেই প্রস্তুতির সময় এখনই। সরকার কি তা ভেবে দেখবে? যদি তেমন কিছু ঘটে, তবেই সাধারণ বর্ষ ও শিক্ষাবর্ষ শুরুর আনন্দ মিলে যাবে।

শফি আহমেদ
সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার
পি-কে-এস-এফ

আ. ন. স হা বী বু র র হ মা ন

গ্রামীণ শিক্ষার বিবর্তন ও জনগণের আকাঙ্ক্ষা

ইংরেজ শাসনামলের শেষ দিকেও আমাদের এ ভূখণ্ডে শিক্ষার প্রসার এতোই সীমিত ছিল যে, কোনো কোনো গ্রামে চিঠি পড়ার মতো একজন মানুষও খুঁজে পাওয়া যেত না। অর্থনৈতিকভাবে সমাজের নিচের অর্ধেক অংশের মানুষের কেউ কেউ পুত্র সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়ে কোনো দোকানের কর্মচারী বা মুহুরি বানানোর স্বপ্ন দেখত। এর উপরের কিছু লোক চেষ্টা করত ছেলেকে কেরানি বা কোনো অফিসের বাবু বানাতে।

আর্থ-সামাজিক অবস্থাভেদে আরো উপরের দিকে স্বপ্ন থাকতো পুত্রকে দারোগা বা ঐ রকম অবস্থানের কর্মকর্তা বানানোর। একেবারে উপরের স্তরের পরিবারগুলোর মধ্যে থাকত ভবিষ্যতে পরিবারে জজ ব্যারিস্টার বা এমনিতর নামিদামি কেউ একজন থাকার আকাঙ্ক্ষা। এরকম অর্জনের বদৌলতে বাড়ির নামকরণেও পদবির উল্লেখ হতো। মুহুরি বাড়ি, পেশকার বাড়ি, কেরানি বাড়ি নামকরণের মাধ্যমে নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়ির পরিচিতি ছিল গর্বের। আর দারোগা বাড়ি বা উকিল মোক্তারের বাড়ি ছিল উচ্চ বিত্তের পরিবারের জৌলুসময় পরিচিতি। মেধার বলে অনেক দরিদ্র পরিবারের সন্তানও উচ্চ শিক্ষায় স্থান করে নিত। কিন্তু তখন তিনি বিত্তবান সমাজেরই একজন হয়ে উঠেছেন।

আমাদের গ্রামীণ কৃষি সমাজে কম লেখাপড়া জানা মানুষ অনেক বড় ভূমিকা রাখতেন। জমির মাপজোক, নকশা বানানো, দলিল তৈরি, ব্যবসার হিসেব-নিকেশ রাখা, প্রয়োজনীয় দলিলপত্র পড়ে দেওয়া এবং যে কোনো কারো হয়ে লেখাপড়ার কাজ চালিয়ে নেওয়া ইত্যাদি কাজ তারাই সারতেন। এসব শিক্ষিত মানুষ আর্থ-সামাজিক অবস্থার দিক থেকে দরিদ্র মানুষের সঙ্গেই বসবাস করতেন। তাদের মধ্যে ছিলেন অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তি। মুখেমুখে বড় বড় হিসেব করে দেওয়া, জমির জটিল নকশা বুঝিয়ে দেওয়া, এমনকি কোনো যোগাযোগের লিখিত মুসাবিদা করে দেওয়ায় তাঁদের দক্ষতার খবর গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ত। এঁদের একটি অংশ গুরুগিরি করতেন। নিজ বাড়িতে গ্রামের ছেলেদের পড়ার ব্যবস্থা করতেন।

নিজে যা যা জানতেন, শিষ্যকে তা জানিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতেন। প্রায়ক্ষেত্রে এসব গুরু এর জন্য কোনো বিনিময় মূল্য নিতেন না। শিষ্যদের পরিবারের ফল-সবজি এগুলোতে যেন এসব গুরুর একটা হিস্যা থাকতো।

সমাজকে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে টেনে তুলতেও সীমিত লেখাপড়া জানা মানুষগুলো অনেক ভূমিকা রেখেছেন। পুকুরের পানি পান থেকে নলকূপের পানি পানে অভ্যস্ত করা, জমিতে যান্ত্রিক পানি সেচ দেওয়া, উচ্চ ফলনশীল ফসলের প্রতি আকৃষ্ট করা, রোগ হলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া এসব বিষয়ে তারা

সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন। ওঝা কবিরাজের অপচিকিৎসা, ভূত ছাড়ানোর নামে মেয়েদের ওপর নির্যাতন রোধেও তাদের অনেকে এগিয়ে আসতেন। তাদের অনেকে গ্রাম্য ডাক্তার হিসেবে মানুষকে চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। এভাবেই গ্রামীণ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সমাজ উন্নয়নে অবদান রেখেছেন। তার সবকিছুই যে ইতিবাচক ছিল এমন নয়। এ শিক্ষিত সমাজেরই একটি অংশ জোতদার মহাজনদের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করেছেন। তাদের শোষণকে পাকাপোক্ত করেছেন। এরা যখন দরিদ্র কৃষককে ভূমিহীনে পরিণত করার কুটকৌশল প্রয়োগ করত, কিছু শিক্ষিত লোক তাতেও সহায়তা জুগিয়েছেন।

এতক্ষণ গ্রামীণ যে শিক্ষিত মানুষের কথা আলোচিত হলো, তার সবটা জুড়ে আছে পুরুষ। গ্রামে মেয়েদের শিক্ষার সূচনা হয়েছে অনেক পরে। বেগম রোকেয়াসহ যারা নারী শিক্ষায় কাজ করেছেন তারা শহর এবং মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চ মধ্যবিত্তের বাইরে যেতে পারেননি। গ্রামীণ মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অনুপ্রবেশ মূলত শহুরে শিক্ষিত শ্রেণির জীবন সঙ্গী হিসেবে প্রস্তুত করার জন্য। তারা শিক্ষালাভ করে পরিবারের বাইরে কারো প্রয়োজনে লাগাতে পারেননি। মেয়েরা শিক্ষিত হওয়ার পর পাঠ্য বইয়ের বাইরের জগতেও কিছুটা প্রবেশ করতে পেরেছেন। শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, মীর মোশাররফ হেসেন প্রমুখ সাহিত্যিকদের লেখার পাঠিকা প্রধানত ছিলেন তারা। শিক্ষিত পুরুষরা জীবন যাপনের সংগ্রামে ব্যস্ত থাকার কারণে ঐ দিকটা কমই মাড়াতেন। শিক্ষিত এসব নারীরা সন্তান তা ছেলে হোক, বা মেয়ে হোক তাদের শিক্ষাদানে মনোনিবেশ করতে পেরেছেন।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত গ্রামীণ সমাজের নিচের অর্ধেক অংশের মধ্যে শিক্ষা প্রায় প্রবেশ করতেই পারেনি। ঐ সময় প্রতি আট জন বয়স্ক লোকের মধ্যে একজন নাম স্বাক্ষর করা পর্যন্ত লেখাপড়া জানতেন। নারীদের ক্ষেত্রে তা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। প্রতি পনের জন বয়স্ক নারীর একজন নাম স্বাক্ষর পর্যন্ত লেখাপড়া জানতেন। ঐ সময় প্রাথমিক শিক্ষায় যারা ভর্তি হতো তাদের শতকরা ২০ জন পর্যন্ত পঞ্চম শ্রেণি অবধি যেতে পারতো। মাঝপথে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার ছিল শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন বাঙালির জীবনে শিক্ষার অপরিহার্যতার উন্মেষ ঘটায়। স্বাধীন দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষাকে উপেক্ষা করে বাঙালি জাতিকে পদানত করে রাখার পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যেও চেতনার সঞ্চার করে। আর তা থেকেই তারাও নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার আলোতে নিয়ে আসতে সচেষ্ট হন। বাহান্ন পরবর্তী সময়ে তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পাকিস্তানি আমলে জনগণের এ আকাঙ্ক্ষার প্রতি কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা বা যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকরা মানবেতর জীবন যাপন করতেন। ফলে শিক্ষার প্রসার হয়েছে খুব ধীর গতিতে। ফলে পাকিস্তানের শেষ সময়ে এ দেশে সাক্ষরতার হার ছিল শতকরা মাত্র ২০ ভাগ। নারীদের সাক্ষরতার হার ছিল পুরুষদের সাক্ষরতার হারের প্রায় অর্ধেক।

মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে বাংলাদেশে মানুষকে শিক্ষিত করার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এজন্য দেশের ৩৬ হাজারের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে শিক্ষকদের সরকারি চাকরিজীবীর মর্যাদা দেওয়া হয়। শিশুদের পোশাক দেওয়ার প্রচলন করা হয়। স্কুলে খাবার দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়। ফলে ভর্তির হার অনেক বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থা বেশিদিন টেকেনি। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দরিদ্র শিশুদের টিকিয়ে রাখার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদির অবসান হয়। যা-ই হোক ১৯৯০ সালের পর দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। ভর্তি ও টিকে থাকায় ছেলে মেয়েতে ব্যবধান কমানো হয়। ২০১৩ সালে একসঙ্গে ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে মানসম্মত পাঠ্যবই প্রদান করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীকে এবং পল্লী অঞ্চলের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বালিকা শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এসব সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহের নেওয়া নানা পদক্ষেপের ফলে ঝরে পড়া দরিদ্র শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করছে।

একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের মানুষ শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে। এমন কোনো গ্রাম পাওয়া যাবে না যেখানে মাধমিক শিক্ষা পর্যন্ত লেখাপড়া করা ছেলেমেয়ে নেই। ঘরে ঘরে মানুষ মোবাইল ব্যবহার করে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। মুহূর্তের মধ্যে দূরদূরান্তে টাকা পয়সার লেনদেন হচ্ছে। প্রতিটি গ্রামে মাছের চাষ, মুরগিপালন, সবজিবাগান সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। গ্রামের

শিক্ষিত মেয়েরা শিক্ষকতাসহ নানা চাকুরি করছেন। মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা অনেক বেড়েছে। নারী-পুরুষের মধ্যে সহযোগিতাও বেড়েছে। গ্রামের শিশুরা শিক্ষাগ্রহণে যথেষ্ট আগ্রহী।

শিক্ষার ক্ষেত্র অনেক সম্প্রসারিত। রেডিও-টেলিভিশনের সম্প্রচার হয় সর্বত্র। পত্র-পত্রিকা প্রকাশের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। দিনের প্রথম ভাগে দৈনিক পত্রিকা পৌঁছে যাচ্ছে দেশের আনাচে কানাচে। প্রায় প্রতি গ্রামে সংবাদপত্রের পাঠক রয়েছে। এঁরা বিশেষ বিশেষ সংবাদ পৌঁছে দেন অন্যদের কাছে। ব্যাপক প্রচার চালিয়ে শিশুদের মারাত্মক রোগের টিকা দেওয়া হয়। ফলে দেশ থেকে পোলিও, যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া রোগ প্রায় নির্বাসিত হতে চলেছে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ায় শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার অনেক কমেছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের সময় এ ভূখণ্ডে একজন মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪০ বছরেরও কম। আর এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ বছরেরও বেশি।

এতসবের পরও চিন্তার বিষয় আছে অনেক। মেয়েদের বাল্যবিবাহ এখনো কমেনি। সমাজে যৌতুকপ্রথা এখন অনেক বেশি জেঁকে বসেছে। ঋণের নানা উৎস থেকে অর্থ এনে তা উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করতে না পেরে অনেক নারী-পুরুষ বিপদগ্রস্ত হচ্ছেন। লেখাপড়া করেও অনেকে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করতে পারছেন না। প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসম্মত লেখাপড়া হচ্ছে না। গ্রামীণ জনসমাজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রয়োজনীয় নজরদারি করছেন না। প্রতিবন্ধীরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। অনেক শিশু প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনের আগে ঝরে পড়ছে। হাওরসহ যোগাযোগবিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়া হচ্ছে খুব কম।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের শুরুর দিকে অবস্থান করছে। তার মানে দেশের উন্নয়ন হয়েছে। এ উন্নয়নে দেশের স্বল্প লেখাপড়া জানা মানুষ অনেক ভূমিকা রাখছেন। কৃষক সারা বছর কৃষি উৎপদন সচল রাখছেন। সেই চল্লিশের দশকের চেয়ে এখন একর-প্রতি ফসলের উৎপাদন বেড়েছে চারগুণ। গার্মেন্টসে যারা কাজ করছেন তাদের বেশির ভাগ হচ্ছেন নারী। আর তারাও লেখাপড়া জানেন খুব কম। আর আছেন প্রবাসে বসবাসকারী মানুষ। এদের মধ্যে অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। এদের লেখাপড়াও খুব কম। দেশকে প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়নে এগিয়ে নিচ্ছেন এসব শ্রমজীবী মানুষ।

আর যদি দেশকে পরিপূর্ণ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে হয় তাহলে শ্রমজীবী মানুষের দক্ষতা বাড়ানোর ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করতে হবে। তাদেরকে উন্নত প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত করতে হবে। তাদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

আগের দিনের শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে চাকরি-প্রাপ্তির বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। পাশ করেই চাকরির জন্য অপেক্ষা। যারা চাকরি পেতেন না তারা সারা জীবন হতাশায় কাটাতেন। এ ব্যাধিটি এখন অনেক ব্যাপক হয়েছে। প্রতি বছর লক্ষলক্ষ নারী-পুরুষ নানা ডিগ্রি নিয়ে শিক্ষাজীবন শেষ করছেন। তারপর চাকরির জন অপেক্ষা। বেশিরভাগ মানুষের জন্য চাকরি হচ্ছে সোনার হরিণ। দেশে বেকারত্বের হার দিনদিন বেড়ে চলেছে। বেকারদের কর্মসংস্থানে সহায়তার জন্য আছে কোচিং সেন্টার। তদুপরি দালালও আছে। এদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন অনেকে। তাই এখন সময় এসেছে আত্ম কর্মসংস্থানের। কীভাবে নিজের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদনশীল কিছু করা যায়, তা এককভাবে ভাবতে হবে, ভাবতে হবে যৌথভাবে। শ্রমজীবী মানুষ যদি ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে, তবে শিক্ষিত নারী পুরুষ কেন পারবে না।

শিক্ষা হচ্ছে উন্নয়নের অনুঘটক। এটি যেমন জীবন জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য দরকার তেমনি আত্মমর্যাদসম্পন্ন করে তোলার জন্যও অপরিহার্য। ঘুষ, দুর্নীতি, নেশা, অমানবিকতা থেকে শিক্ষা মানুষকে দূরে রাখবে। শিক্ষার সঠিক প্রয়োগে সমাজে ন্যায় বিচার এবং ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মানুষকে নিবৃত্ত রাখতে ভূমিকা রাখবে। শোষণ, নিপীড়ন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে মানুষকে উৎসাহিত করবে। এ শিক্ষা প্রয়োগের ফলে যেন এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যেটি হবে নারী-পুরুষ বৈষম্যহীন, পরিবেশ-বান্ধব, প্রতিবন্ধীদের প্রতি মানবিক আচরণ প্রদর্শনকারী, জাতি- ধর্ম-বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান মর্যাদাপ্রতিষ্ঠাকারী এবং সকল প্রকার বৈষম্যের অবসানকারী। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ এরকম একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘটিত হয়েছিল। আর তাই শিক্ষার মাধ্যমে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করছি।

আ.ন.স হাবীবুর রহমান
শিক্ষা ও উন্নয়ন গবেষক

আইনুন নাহার বেগম

বাংলাদেশে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার বিবর্তন

বাংলাদেশে আশির দশক থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাধারায় বয়স্ক, কিশোর, শিশু-শিক্ষার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা/নন-ফরমাল প্রাইমারী এডুকেশন (এনএফপিই) কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে সেই সব শিশুদের জন্য, যারা স্কুলে লেখাপড়া করার আদৌ সুযোগ পায় নি এবং যারা স্কুলে ভর্তি হয়েও বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করার আগেই লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষায় নানামুখী উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষায় শিশুর অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই অন্তর্ভুক্তিতে মেয়ে শিশুর অংশগ্রহণ ভূয়সী প্রশংসিত হচ্ছে। তবে বিভিন্ন গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী দেশে এখনো শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত অনেক শিশু রয়েছে।

সরকারী হিসেব মতে দেশে ৫.৫ মিলিয়ন শিশু শিক্ষাবঞ্চিত রয়েছে, যাদের বয়স ৬ থেকে ১৪ এর মধ্যে এবং এসব শিশু তাদের বয়সী শিশুর শতকরা ১৬ ভাগ (সূত্রঃ Annual Sector Performance Report ২০১৪)। বেসরকারি হিসেবে এ সংখ্যা আরো অনেক বেশি হতে পারে। তাছাড়া, দেশে রয়েছে অনেক দুর্গম এলাকা, যেমন; হাওর, চর, উপকূলীয় এলাকা, পাহাড়ি এলাকা, চা বাগান, মংগাপীড়িত এলাকা। এসব দুর্গম এলাকার শিশুদের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছানোর সরকারি বেসরকারি প্রচেষ্টার তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয় নি। তবে কি! সকল শিশুর জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার সরকারি প্রতিশ্রুতি অধরাই রয়ে যাবে?

শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত শিশু, যারা আদৌ স্কুলে যায় নি এবং যারা কিছুদিন স্কুলে লেখাপড়া করার পর লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, তাদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (এনএফপিই) কার্যক্রম একটি বিকল্প (alternative) ব্যবস্থা। বর্তমান উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায়, উপ-আনুষ্ঠানিক ধারার পূর্বের কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বর্তমানে আনুষ্ঠানিক/প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক/প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিপূরক ও বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত। অনেকে তাই উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষাকে শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ হিসেবে অভিহিত করছেন। তবে প্রকৃতিগতভাবে তা দ্বিতীয় সুযোগ কি না, তা নিয়ে বিতর্কও আছে। কারণ অনেক শিশুর জন্য এই ব্যবস্থা প্রথম সুযোগও বটে।

উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার (এনএফপিই) বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ সরকার ও বেসরকারি সংস্থা/নন গভর্নমেন্ট অরগানাইজেসন(এনজিও) মূলত উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার দুই বাহক। অবশ্য এক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে Bureau of Non Formal Education (BNFE) পরিচালিত কার্যক্রম Basic Education for Hard to Reach Urban Working Children(BETHRUWC) প্রকল্প একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। এই প্রকল্পের মেয়াদ ছিল ২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, সরকার বিভিন্ন এনজির মাধ্যমে দেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য এই শিক্ষা

কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করেছে। জীবন দক্ষতাভিত্তিক মৌলিক শিক্ষা এই কার্যক্রমের মূল উপাদান ছিল। শিশুকেন্দ্রিক শিখন শেখানো পদ্ধতি, সরকারী শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নিজস্ব শিক্ষাক্রম, নিজস্ব শিখন-শেখানো উপকরণ (পাঠ্য বই, সহ-শিক্ষা উপকরণ প্রভৃতি) ব্যবহারে কার্যক্রমের ইতিবাচক ফলাফল লক্ষ করা যায়। এই কার্যক্রমের সাফল্য অনুকরণযোগ্য।

বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরিচালিত Out of School Children (ROSC) উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার আর একটি সরকারি উদ্যোগ। 'আনন্দ স্কুল' নামের এই স্কুলগুলো বিভিন্ন এনজির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকার শিক্ষা বঞ্চিত ও শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার জন্য কাজ করছে।

বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকারের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন ও সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার পূরণে বেসরকারি সংস্থাসমূহের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কার্যকরী ও সফল মডেল উদ্ভাবন ও ব্যবহারে এনজিওসমূহ যথার্থই কৃতিত্বের দাবিদার। যদিও ভিন্ন ভিন্ন এনজিওর এনএফপিই মডেলের মধ্যে সাদৃশ্য ও ভিন্নতা দুইই রয়েছে। Mapping of Non Formal Primary Education , BNFE, ২০০৯ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেশে ৭০০ এনজিও পরিচালিত এনএফপিই কার্যক্রম প্রায় ১.৯ মিলিয়ন শিশুকে মৌলিক প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে সমর্থ হয়েছে। বর্তমানে এ সংখ্যা আরো বেশি হবে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক এক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকায় রয়েছে। প্রায় ৫০০ এনজিও ব্র্যাকের Education Support Programme (ESP) এর সহায়তায় এনএফপিই কার্যক্রম ব্র্যাক মডেলে বাস্তবায়ন করছে।

আশির দশক থেকেই এদেশে এনজিওসমূহ উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে কাজ শুরু করে। এসব সংস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংস্থা হলো ব্র্যাক, কারিতাস, সিসিডিবি, ডানিডা, কনসার্ন, গণ সাহায্য কেন্দ্র, গণ সাহায্য প্রচেষ্টা, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, রংপুর দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস, ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার এবং এফআইভিডিবি। পরবর্তী কালে ঢাকা আহছানিয়া মিশন, গণ সাহায্য সংস্থা, সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর পরিষদ, প্রশিকা, জাগরণী চক্র, সি এম ই এস এবং আরো অনেক সংস্থা শিক্ষা নিয়ে কাজ শুরু করে।

প্রথম দিকে প্রায় সকল এনজিও বয়স্ক শিক্ষা নিয়ে কাজ শুরু করলেও পরবর্তী কালে কমিউনিটিতে শিশু কিশোরদের জন্য শিক্ষার চাহিদা তৈরি হয়। স্থানীয় জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে ধীরে ধীরে পরিকল্পিত ও পরিচালিত হতে শুরু করে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। (সূত্রঃ Non Formal Education,Bangla Pediea) এভাবে গত চার দশক ধরে কাজ করে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাস্তবধর্মী, চাহিদাভিত্তিক কার্যকর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আমাদের দেশের এনজিওগুলো তৃণমূল পর্যায়ে সফলভাবে কাজ করার উদাহরণ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। অনেক এনজিওর এনএফপিই মডেল বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুসৃত হচ্ছে, যেমন; ব্র্যাক, গণ সাহায্য সংস্থা।

এনএফপিই কার্যক্রমের সাফল্যের মর্মকথা

এনএফপিই কার্যক্রমের সব চেয়ে বড় সুবিধা হলো এর নমনীয়তা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। এটি একটি চাহিদা-ভিত্তিক কার্যক্রম, যেখানে স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও প্রয়োজনকে সবার আগে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কার্যক্রমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ থাকে সর্বতোভাবে, যা কার্যক্রমের স্থায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে থাকে। বিনা মূল্যে অথবা কম ভাড়ায় কমিউনিটি থেকে স্কুলের জন্য ঘর পাওয়া যায়। প্রতিটি স্কুলের একটি করে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি স্কুলের সার্বিক অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে থাকে। স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ৭ থেকে ১৫ জন পর্যন্ত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। কমিটি শিক্ষার্থীর মাতা পিতা/অভিভাবক, স্থানীয় নেতা, সমাজের অভিজাত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, কর্মজীবী শিশুদের ক্ষেত্রে মালিক শ্রেণি, স্থানীয় আনুষ্ঠানিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক, এনএফপিই স্কুলের শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত হয়। অধিকাংশ এনজিওর স্কুলে মাসিক/দ্বিমাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক অভিভাবক সভার আয়োজন এখন এনএফপিই কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং নিয়মিত স্কুল পরিদর্শন করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উপস্থিতি পর্যবেক্ষণসহ শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। নিয়মিত অভিভাবক সভা ও স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এসকল কাজের সমন্বয় করে থাকেন সংশ্লিষ্ট সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ।

জাতীয় শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষাক্রম ব্যবহারের ফলে এনএফপিই শিক্ষার্থীরা কোর্স সম্পন্ন করে মূলধারার শিক্ষায় সম্পৃক্ত হতে পারছে। কোনো কোনো এনজিও সরাসরি ন্যাশনাল কারিকুলাম এ্যান্ড টেকস্ট বুক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও শিখন শেখানো উপকরণ (পাঠ্য বই ও সহ-শিক্ষা উপকরণ) ব্যবহার করে থাকে। আবার কোনো কোনো এনজিও

প্রয়োজনে জাতীয় শিক্ষাক্রমের কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করে ব্যবহার করে থাকে। তবে শিক্ষাক্রমে উল্লেখ্য শিখনফল ও প্রান্তিক যোগ্যতা যাতে শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে সমর্থ হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। এনএফপিই গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হয়ে থাকে অথবা উপার্জনমূলক কাজের সাথে যুক্ত হতে পারে। এদের মধ্যে অনেকে পরবর্তী কালে লেখাপড়ায় ভালো ফলাফল ও কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে।

এনএফপিই কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি সহ-পাঠ উপকরণ হিসেবে গল্পের বই ও অন্যান্য বই পড়ার সুযোগ থাকায় তারা সহজেই সাবলীল পাঠক হতে পারে এবং নিজের কথা গুছিয়ে বলার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। সংস্থা নিজে সহ-পাঠ উপকরণ প্রণয়ন করে থাকে অথবা অন্য সংস্থা বা স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করে।

এনএফপিই কার্যক্রমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত সাধারণত ১ঃ৩০ অথবা ১ঃ৪০ হয়ে থাকে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর এই অনুপাত শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যকার সম্পর্ককে নিবিড় করে তোলে। শিক্ষক শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগী হতে পারেন এবং সকলের শিখন চাহিদা প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠ পরিচালনা করতে পারেন। এদেশে এনএফপিই কার্যক্রমের শুরুতে এক কক্ষ বিশিষ্ট শ্রেণিতে একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ৩০/৪০ শিক্ষার্থী নিয়ে শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করাকে এনএফপিইর একটি বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হতো । কিন্তু বর্তমানে অনেক এনজিও একাধিক শিক্ষক ও একাধিক শ্রেণিকক্ষে এনএফপিই কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে।

এনএফপিই কার্যক্রমে শিখন শেখানো প্রক্রিয়া হয়ে থাকে শিশুকেন্দ্রিক। শ্রেণিকক্ষে ভীতিহীন পরিবেশে শিশু শিখন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হতে পারে, ফলে লেখাপড়া শিশুর জন্য আনন্দদায়ক হয়ে থাকে। শিশুর শিখন দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য নানারকম উদ্ভাবনীমূলক কৌশলের ব্যবহার এনএফপিই কার্যক্রমে লক্ষ করা যায়, যেমন, বিষয়ভিত্তিক নানারকম Activity-র ব্যবহার। শ্রেণিকক্ষে এসমস্ত Activity পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় শিক্ষা উপকরণের। পাঠের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এসব উপকরণ শিক্ষক নিজে তৈরি করেন। আবার কখনো কখনো শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে উপকরণ তৈরি করা হয়। কখনো কখনো উপকরণ তৈরিতে অভিভাবক ও কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে শিখন শিখতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে, আর এরূপ ব্যবস্থাপনা শিশুর শিখনকে অর্থবহ করে তোলে। এনএফপিই কার্যক্রমে উপকরণের ব্যবহার একটি অনন্য উদাহরণ। পাঠকে সহজভাবে উপস্থাপন করতে, শ্রেণিকক্ষকে আনন্দদায়ক করতে এবং শিশুর শিখন দীর্ঘ স্থায়ী করতে শিক্ষা উপকরণের প্রভূত ভূমিকা রয়েছে।

শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক হচ্ছেন এনএফপিই কার্যক্রমের প্রাণকেন্দ্র। এলাকার স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বাসিন্দাকে এনএফপিই স্কুলের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এনএফপিই কার্যক্রমে ৯৮% শিক্ষকই নারী। শিক্ষক নির্বাচনে শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণে এনজিওগুলোর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসএসসি পাশ ধরা হলেও কোনো কোনো সময় কম শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়ে শ্রেণি পরিচালনার পারঙ্গমতাকে গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। শিক্ষকগণের শিক্ষণ দক্ষতা তৈরি ও বৃদ্ধির জন্য এনএফপিই কার্যক্রমে একদিকে যেমন রয়েছে প্রি-সার্ভিস ও ইন-সার্ভিস বিভিন্ন ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং তার সাথে শিক্ষকগণের সার্বক্ষণিক সহযোগিতার জন্য রয়েছে সুপারভিশন ও মনিটরিং-এর ব্যবস্থা। আধুনিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষকগণ হাতে কলমে প্যাডাগোজির সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়ে সমৃদ্ধ হন। এসকল শিক্ষক, প্রশিক্ষণ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলে বিশেষভাবে সুপারভাইজার ও মনিটরগণও পেয়ে থাকেন।

এনএফপিই কার্যক্রমের সফলতার একটি বড় উৎস হলো কাঠামোগতভাবে সুপরিকল্পিত অথচ নমনীয় সুপারভিশন ও মনিটরিং ব্যবস্থা। মাঠ পর্যায়ের কর্মরত সুপারভাইজর/ কর্মসূচি সংগঠক/ কর্মসূচি সহযোগী যে নামেই আখ্যায়িত হোক না কেন, তাদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট সংখ্যক স্কুলে থাকে। স্কুলগুলোর সবধরনের একাডেমিক ও লজিস্টক সাপোর্ট তারা দিয়ে থাকেন। স্কুল সুপারভিশনে প্রশাসনিক সুপারভিশনের চেয়ে একাডেমিক সুপারভিশনের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। সুপারভিশনের সময় সুপারভাইজারগণ দুইভাবে সহযোগিতা করে থাকেন। প্রয়োজন হলে তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যার সমাধান দিয়ে অথবা রিফ্রেশার প্রশিক্ষণের সময় কোনো বিষয়ের সমাধান দিয়ে। সব চেয়ে বড় কথা হলো, তুলনামূলকভাবে এনএফপিইতে শিক্ষার জন্য খরচ কম হয়ে থাকে।

এনএফপিইর জন্য বিশেষ ভাবনা

প্রতিটি শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকার আছে। তা সে যে দেশে, যে স্থানে জন্মগ্রহণ করুক না কেন অথবা যেকোনো ধর্ম, বর্ণ বা সম্প্রদায়ের হোক না কেন। সে যে ভাষায় কথা বলুক না কেন অথবা সমাজের অসুবিধাগ্রস্ত যে কোনো স্তরের মানুষের সন্তান হোক না কেন। দুঃখজনক হলো,আমাদের দেশের অনেক শিশুই শিক্ষা লাভের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। শিক্ষাবঞ্চিত এসব শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকার এবং আমাদের সকলের। এ পর্যায়ে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো একটি বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে। তবে উপ-আনুষ্ঠানিক

প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামোকে আরো বেশি গতিশীল ও অর্থবহ করার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি বাস্তবায়ন, সামাজিক আন্দোলন, স্কুল পর্যায়ে আরো বেশি শিশুর জন্য মনোবিজ্ঞানভিত্তিক পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ ও অবকাশ রয়েছে।

প্রথমত ধরা যাক, ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকারের যে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পলিসি প্রণীত হয়েছে তার কার্যকর বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা প্রয়োজন। উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার ও বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। যাতে অপেক্ষাকৃত ভালো পদ্ধতি নির্বাচনে এনএফপিই বাস্তবায়নকারী সংস্থা অনুপ্রাণিত হতে পারে। এক্ষেত্রে গণসাক্ষরতা অভিযান সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করতে পারে।

দ্বিতীয়ত গত চার দশক ধরে ক্রমাগত উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে কাজ করার ফলে সমাজ/কমিউনিটিগুলো প্রশিক্ষিত হয়েছে। কীভাবে একটি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করা হয়, শিশুর লেখাপড়ার জন্য কীভাবে একটি শিশুবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়, এসব বিষয় সমাজ/কমিউনিটিগুলো নিজেরা কাজ করে শিখেছে। তারা এখন দেশের সম্পদ। আরো একটি মূল্যবান সম্পদ হলো, উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষকগণ। তারা সমৃদ্ধ হয়েছেন জ্ঞানের দিক থেকে এবং তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সম্পদ দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে সমর্থ। এ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হওয়া দরকার।

বাস্তবতা হলো যে, আমাদের দেশের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পভিত্তিক দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তাপুষ্ট। দাতার অনুদান বন্ধ হয়ে গেলে বা এনজিও কার্যক্রম শেষ হয়ে গেলে কমিউনিটির স্কুলগুলোর স্থায়িত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। পরামর্শ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, এনএফপিই বাস্তবায়নকারী সংস্থা কার্যক্রমের শুরু থেকেই কমিউনিটির সঙ্গে কার্যকরী এ্যাডভোকেসি পরিকল্পনা করবে এই মর্মে যে, দাতা-নির্ভর এনজিও কার্যক্রমের অনুপস্থিতিতে কার্যক্রম কীভাবে অব্যাহত রাখা যায়। এই এ্যাডভোকেসি ও পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্কুলের ব্যয়ের অর্থ প্রাপ্তির উৎস ও স্কুল পরিচালনার দায়িত্বের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা।

তৃতীয়ত এখন পর্যন্ত আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সিলেবাস নির্ভর এবং যা মুখস্থ করার প্রবণতাকে উৎসাহিত করে থাকে। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াও সকল শিশুর শিখন নিশ্চিত করতে পারে না। কারণ শিক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনায় বেশির ভাগ সময় সকলকে উদ্দেশ্য করে পাঠ পরিচালনা করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সকল শিশু একরকমভাবে একই বিষয় শেখে না। প্রতিটি শিশু একক ও অনন্য। প্রতিটি শিশু শিখন শেখে তাদের নিজস্ব গতি, পছন্দ ও প্রয়োজন/চাহিদা অনুযায়ী। এই সত্যকে মূল ধরে শিক্ষক, শিক্ষাব্যবস্থাপক/সংগঠক সকলের উচিত হবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনা ও পরিচালনা করা। সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে এর কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে যখন এনএফপিই কার্যক্রম নেওয়া হয়ে থাকে, স্কুলে যেতে না পারা এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশুদের জন্য। কার্যক্রমে আগত প্রতিটি শিশু এক ধরনের শিখন স্তর সম্পর্কে (learning level) নিয়ে আসে। এজন্য শিক্ষকের প্রথমে জানা দরকার প্রতিটি শিশু শিক্ষার্থীর শিখন স্তর। তিনি প্রথমে বেইস লাইন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন স্তর অবগত হবেন। তারপর শিক্ষার্থীদের শিখন স্তর অনুযায়ী ৪/৫ টি দল/গুচ্ছে বিভক্ত করবেন। দলে বিভক্ত শিক্ষার্থীদের শিখন স্তর অনুযায়ী শিক্ষণের জন্য তিনি পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। পাঠ পরিকল্পনায় উল্লেখ করতে হবে, প্রতি স্তরের শিক্ষার্থীদের তিনি কী শেখাতে চান, কীভাবে শেখাতে চান, পাঠ শেষে কীভাবে শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন করতে চান। পাঠ পরিকল্পনায় খুব স্পষ্ট করে টার্গেট অর্থাৎ শিখনফল, শিখন পদ্ধতি, শিখন শেখানো সামগ্রী ব্যবহারের কৌশল উল্লেখ থাকতে হবে। একটি ভালো প্রস্তাব হলো, পনেরো কর্ম দিবসের জন্য পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা দৈনিক পাঠ-পরিকল্পনায় বিভক্ত হবে। পনেরো কর্ম দিবসের শেষ ৩/৪ দিন শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য রেখে অবশিষ্ট দিনগুলোতে মূল পাঠ পরিচালনা করা।

শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ শিক্ষার্থীর ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি অন্যান্য বিষয়ের শিখনকে সহজ ও সম্ভব করে তোলে। শিক্ষার্থীর ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির অনেক ধরনের কৌশল ও পদ্ধতি রয়েছে। সর্বাপেক্ষা কার্যকরী কৌশল নির্বাচনে সর্তকতা ও সচেতনতা থাকা দরকার।

শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের প্রতিটি সময়ের সঠিক ব্যবহার ও অর্থপূর্ণ সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষাকেন্দ্রে প্রত্যেক শিশুকে-

- কথা বলতে দিতে হবে
- প্রশ্ন করতে পারবে এমন ভরসা দিতে হবে।
- নিজের মতামত প্রকাশ ও অভিজ্ঞতা বলতে পারার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

তবেই তো শিক্ষাকেন্দ্র হবে শিশু শিক্ষার্থীর জন্য বিশ্বাস আর নির্ভরতার আলয়।

আইনুন নাহার বেগম
শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও জেন্ডার বিশেষজ্ঞ

মুহম্মদ হাসান খালেদ

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যস্ত কৃষি ব্যবস্থাপনা

পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটছে। এ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতার মাত্রাও বিভিন্ন ধরনের। সংগঠিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে উত্তরণে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশকেই অন্যান্য দেশের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করতে হয়। এ জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী পৃথিবীতে যে বড় ধরনের দুর্বিপাকগুলো সংগঠিত হয় এবং এর তীব্রতার ফলে যদি প্রাণহানি বা সম্পদহানির মত ঘটনা সংগঠিত হয় তাকে 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ' বলা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের গভীরতা বা তীব্রতা নিরূপণ করা হয় সাধারণত মানুষের জীবনহানি, অর্থনৈতিক ক্ষতি ও ক্ষতি পূরণের সামর্থ্যের ওপর। Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED,2009) এবং the Munich Reinsurance Company (Munich RE) -র মতে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হল :

"A situation or event which overwhelms local capacity, necessitating a request to a national or international level for external assistance and an unforeseen and often sudden event that causes great damage, destruction and human suffering."

CRED I Munich RE এর মতে কোন প্রাকৃতিক ঘটনাকে 'দুর্যোগ' নামে অভিহিত করতে হলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের যে কোন একটি পূরণ করতে হবে। যেমন: ১) দশ বা দশের অধিক জীবনহানি; ২) একশত বা তার অধিক লোক আহত হলে; ৩) জাতীয় দুর্যোগ ঘোষণা করা হলে এবং ৪) আন্তর্জাতিক সহায়তার আহ্বান জানানো হলে।

Munich RE এর তথ্য মতে ২০১৩ বৎসরে বিশ্বব্যাপী ৮৯০টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংগঠিত হয়। এ সকল দুর্যোগে ২০,৫০০ জন মানুষ আঘাত প্রাপ্ত হয়। ঐ বৎসরে সংগঠিত দুর্যোগে সর্বমোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; যার মধ্যে বীমাকৃত ক্ষতি ৩৫ শতাংশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৩ সালে সংগঠিত দুর্যোগগুলোর মধ্যে ৪৪ শতাংশ Meteorological আবহাওয়া সম্পর্কিত ৩৭ শতাংশ ছিল Hydrological পানিবাহিত (বন্যা); ১০ শতাংশ ছিল ভূ-তাত্ত্বিক বিষয়ে (ভূমিকম্প ও সুনামি) এবং ৯ শতাংশ আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত (যেমন-খরা ও দাবানল)। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশ বিশ্বের অতিমাত্রার প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন ইত্যাদি দুর্যোগগুলো বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত সংগঠিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রায় ৩.১৮ মিলিয়ন হেক্টর জমিই প্রতি বৎসর

বন্যাক্রান্ত হয়, যা দেশের মোট কৃষিজমির প্রায় ৩৮ শতাংশ। প্রতি বৎসর বন্যার কারণে কৃষকের কোটি কোটি টাকার ফসল, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশে সাধারণত কয়েক ধরনের বন্যা হয়ে থাকে। হঠাৎ বা আকস্মিক বন্যা বা Flush Flood, নদী সৃষ্ট বন্যা বা Reverine Flood, বৃষ্টিপাতজনিত বন্যা বা Rainwater Flood। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে বাংলাদেশে মোট সাতটি বড় বন্যা সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৯৮ সালে ভয়াবহ বন্যা পশু সম্পদ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আর্থিক ঝুঁকির পরিমাণ প্রায় ৩০৭৯৩.৩৮ মিলিয়ন টাকা। ঐ বন্যায় প্রায় ১,৩৫,০০০টি গরু, ছাগল ও ভেড়া প্রাণ হারায়; যার আর্থিক ক্ষতি ছিল ৩৩.১৩ মিলিয়ন টাকা। অন্যদিকে, প্রায় ৪.৭০ কোটি গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী নানাভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশে সংগঠিত ২০০৭ সালের আকস্মিক বন্যায় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের প্রাথমিক জরিপ হতে জানা যায়, ২৮৬ মিলিয়ন ডলারের ফসল বিনষ্ট হয়। প্রায় ৪,৬৯,০০০ হেক্টর কৃষি জমির ধান, পাট, সবজি ও মসলা জাতীয় ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও ব্যাপক পরিমাণ মৎস্য সম্পদও ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

খরা বাংলাদেশের আরো একটি বড় প্রাকৃতিক ঝুঁকি। খরা সাধারণ Pre বা Post monsoon সময়ে সংগঠিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের কৃষিজমির ২.২ মিলিয়ন হেক্টর খরা আক্রান্ত অঞ্চলে অবস্থিত। বিগত ৫০ বৎসর বাংলাদেশ অন্তত ২০টি খরা বা খরা সাদৃশ্য ঝুঁকিতে পড়েছিল। বাংলাদেশে প্রতি রবি মৌসুমে ১.২০ মিলিয়ান হেক্টর ফসলী জমি বিভিন্ন মাত্রায় খরাক্রান্ত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ প্রতি ২.৫ বৎসর অন্তর খরার সম্মুখীন হলেও স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন মাত্রায় প্রায়ই খরা সংগঠিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রতি বৎসর জরিপ মৌসুমে সংগঠিত খরা প্রায় ২.৩২ মিলিয়ন হেক্টর জমির T-আমন ক্ষতির কারণ।

সাইক্লোন বাংলাদেশের বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই দুর্যোগেও কৃষির ক্ষতির মাত্রা ব্যাপক। সাইক্লোনের ফলে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে দেশের প্রত্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলগুলো আক্রান্ত হচ্ছে। বাংলাদেশে সৃষ্ট প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় 'আইলা'-তে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৪৮ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ৬ লক্ষাধিক ঘর-বাড়ি ও ৩১ লক্ষাধিক হেক্টর জমির ফসল বিনষ্ট হয়। এর পূর্বে সুপার সাইক্লোন 'সিডর'-এ ২০ লক্ষাধিক লোক তাদের কাজ হারায়, ৫৫ হাজার লোক আঘাত প্রাপ্ত হয়। Department of Agriculture Extension of Bangladesh-এর তথ্য মতে, সুপার সাইক্লোন 'সিডার'-এ ১.২৩ মিলিয়ন টন ধান বিনষ্ট হয়। যার মধ্যে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ৪টি জেলাতে ফসল ক্ষতি হয় ৫৩৫,৭০৭ টন এবং কম আক্রান্ত ১৭টি জেলায় ক্ষতি হয় ২০৩,৬০০ টন ধান। কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতি হয় প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। সামুদ্রিক সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলার লক্ষ লক্ষ একর জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের লবণাক্ততা আক্রান্ত জমির পরিমাণ প্রায় ১.৭৩ মিলিয়ন হেক্টর। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল মূলত লবণাক্ততার শিকার।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ উপকূলের অন্যান্য অংশে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে প্লাবন, জলাবদ্ধতা, জলোচ্ছ্বাস ও অতিরিক্ত জোয়ারজনিত কারণে লবণাক্ততা আরও ভিতরে প্রবেশ করছে। এখানে উল্লেখ্য, ৮০'র দশকে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততায় আক্রান্ত জমির পরিমাণ ছিল ৮,৩০,০০০ হেক্টর। মাত্র দুই দশকে তা বেড়ে ৩০ লক্ষ হেক্টর অতিক্রম করে (করিম ও ইকবাল, ২০০৩)। লবণাক্ততার ব্যাপক বৃদ্ধির কারণে কৃষি জমি চিংড়ি ঘেরে পরিণত হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে বর্তমানে বোরো ধানের আবাদ হচ্ছে। এখানে কিছু কিছু এলাকায় গমের আবাদও হয়ে থাকে। কৃষি জমির লবণাক্ততার ফলে সি-৩ (ধান, গম ইত্যাদি ও সি-৪ (আখ) ও অন্যান্য ফসলের আবাদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জলাবদ্ধতা একটি নতুন সমস্যা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এ অঞ্চলে জলাবদ্ধতার প্রধান কারণ উপকূলীয় অঞ্চলে অনেকগুলো নদীর প্রাকৃতিক জল নিষ্কাশন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে বৃষ্টি বা জোয়ারজনিত কারণে পানি সরতে না পারা। এছাড়াও বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলের জমিগুলোকে লবণাক্ততা থেকে রক্ষা করার জন্য বেশ কিছু পোল্ডার নির্মাণ করা হয়েছিল, যার ফলে পলি পড়ে পোল্ডারের বাইরের নদীর তলদেশ ও জমি উঁচু হয়ে যায়, যা পানি নিষ্কাশনে দীর্ঘস্থায়ী ব্যতয় ঘটায় এবং জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। এ ধরনের জলাবদ্ধতার ফলে কৃষি জমি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং কৃষকদের জীবন জীবিকা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণেই পৃথিবীতে আজ প্রাণের অস্তিত্ব। অনুকূল জলবায়ুর কারণে বিশ্বে এত জীববৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি। অথচ বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ 'জলবায়ু পরিবর্তন' বা 'ক্লাইমেট চেঞ্জ'। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর গড় বাৎসরিক তাপমাত্রা বাড়বে, বৃষ্টি ও তুষারপাতে পরিবর্তন হবে, চরম আবহাওয়া (বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) জনিত ঘটনার পৌনঃপুনিকতা বাড়বে, বর্তমান আবহাওয়া বা জলবায়ু সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যগত সমস্যা আরও জটিল হবে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের নীচু উপকূলীয় এলাকা লবণাক্ত পানির নীচে তলিয়ে যাবে, কৃষির

ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণে খাদ্য নিরাপত্তাজনিত বহুবিধ সমস্যা প্রকটতর হবে। জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলিতে এবং এসব দেশের শিশু ও নারীদের জীবনকে বিশেষভাবে বিপন্ন করে তুলবে। সামগ্রিকভাবে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের বর্তমান পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলি আরও ভয়াবহ ও সংকটাপন্ন হবে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের এক অসহায় শিকার। International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) এর মতে, বাংলাদেশ অধিকতর বন্যা ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। সুনামিজনিত দুর্যোগে বাংলাদেশ তৃতীয় মারাত্মক হুমকির দেশ এবং মনুষ্য ক্ষতির বিবেচনায় সাইক্লোন-এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৬ষ্ঠ। জার্মানিভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'জার্মান ওয়াচ' ২০০৮ সালে পোল্যান্ডের 'জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলন'-এ জানিয়েছে, ২০০৭ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। জলবায়ু পরিবর্তন এ দেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত করছে। ত্বরিত জলবায়ু পরিবর্তন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে নাজুকতা বৃদ্ধি করছে। Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে- বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভয়াবহ বন্যার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বেড়েছে। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীরে প্রবেশ করেছে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)' এর তথ্য মতে, বাংলাদেশে লবণাক্ত জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০ লক্ষ ৫৬ হাজার হেক্টর এবং যা ক্রমাগত বাড়ছে। (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫শে নভেম্বর ২০১২)। National Adaptation Programme Action (NAPA) কর্তৃক জরিপে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কৃষি সেক্টরে তিনটি প্রধান আশঙ্কাজনক ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা হয়েছে- (ক) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খরার প্রভাব আরো বিরূপ আকার ধারণ করবে; (খ) উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা আরো বৃদ্ধি পাবে; (গ) দেশে আরো প্রবল বন্যা, প্রচণ্ড ঝড় দেখা যাবে। পরিমিত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আউশ উৎপাদন ২৭ ভাগ এবং গম উৎপাদন ৬১ ভাগ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বোরো উৎপাদন ৫৫ ভাগ থেকে ৬২ ভাগ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে গমে ফুল আসার সময় পরাগরেণু তার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফলে গমের ফলন কমে যাচ্ছে এবং দানা ছোট হয়ে যাচ্ছে। বোরো মৌসুমে মার্চ-এপ্রিল মাসে তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রী সে. এর বেশি হলে ধানে চিটার পরিমাণ বেড়ে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ধানের উৎপাদন কমবে প্রায় ৮% এবং গমের প্রায় ৩২%। Bangladesh Poultry Industries Association (BPIA) এর তথ্য মতে, ২০১২ সালের শৈতপ্রবাহে দেশে প্রায় ২০,০০০ মুরগি মারা গিয়েছিল। দৈনিক ডিম উৎপাদন ৩.০ লক্ষ থেকে ২.৭০ লক্ষে নেমে যায় এবং ব্রয়লার মুরগির ওজন কমে এসেছিল (IDLC Monthly Business Review, জানুয়ারি, ২০১৩)। প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঘন ঘন ফসলহানির কারণে দ্রব্যমূল্যের বাজার অস্থিতিশীল হয়ে উঠে এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে কৃষি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় জাতীয় পর্যায়ে জিডিপির প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন দেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্থ করছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির ফলে দেশ বাৎসরিক ৩-৪ শতাংশ বাড়তি জিডিপি অর্জন হতে বঞ্চিত হচ্ছে। ত্বরিত জলবায়ু পরিবর্তন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে নাজুকতা বৃদ্ধি করছে, বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষি ব্যবস্থাকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করে তুলছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে কৃষি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় জাতীয় পর্যায়ে জিডিপির প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন দেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত করছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির ফলে দেশ বাৎসরিক ৩-৪ শতাংশ বাড়তি জিডিপি অর্জন হতে বঞ্চিত হচ্ছে। ত্বরিত জলবায়ু পরিবর্তন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে নাজুকতা বৃদ্ধি করছে, বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি কৃষি ব্যবস্থাকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করে তুলছে।

মুহম্মদ হাসান খালেদ
মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

মো. রহমতউল্লাহ্

কওমি মাদ্রাসায় যুক্ত করতে হবে কর্মমুখী ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা

বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসারে দানশীল মানুষের অবদান সবচেয়ে বেশি। কোন সরকারই কওমি মাদ্রাসার ভবন তৈরি এবং এর শিক্ষক-শিক্ষর্থীদের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কোন আর্থিক অনুদান প্রদান করেনি; যেমনটি করেছে আলিয়া মাদ্রাসার ক্ষেত্রে। হয়ত সব সরকারই এমন ধারণা পোষণ করেছে ও করছে যে, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষালয় শিক্ষিতরা যেহেতু জাতীয় উৎপাদনে ভূমিকা রাখার কোন যোগ্যতা লাভ করে না এবং দেশের জিডিপিতে যেহেতু তাদের তেমন কোন ভূমিকা নেই,

সেহেতু কর্মমুখী জনগণের করের টাকায় গঠিত সরকারি কোষাগার থেকে তাদের পিছনে অর্থ ব্যয় করা অনুচিত। এ কথা মিথ্যা নয় যে, কওমি মাদ্রাসায় প্রচলিত শিক্ষায় শিখানো হয় না কোন আধুনিক কর্ম কৌশল।

মুখস্থ করানো হয় কেবল কোরআন ও হাদিস। এর পাশপাশি সেখানে শিখানো হয় না আধুনিক কৃষি কাজ, হাঁস-মুরগি গরু-ছাগল লালন পালন, মাছ চাষের নিয়মকানুন, জামা-কাপড় সেলাই কৌশল, ছোট/বড় কোন কারখানার কাজ, দালানকোঠা নির্মাণ কাজ, কম্পিউটার পরিচালনা, মানুষের প্রয়োজনীয় কোন পণ্যের উৎপাদন ও উদ্ভাবন।

আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি তো দূরের কথা এমনকি সঠিকভাবে শিখানো হয় না মাতৃভাষা বাংলা। তদুপরি, বড় কিতাবগুলো উর্দুতে পড়ানোর কারণে এবং বাংলা ভালো না জানার কারণে তারা করতেও পারে না আরবির উত্তম অনুবাদ; যা সহজেই সাধারণের বোধগম্য হবে। সেই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে তারা জানতে পারে না বর্তমান বিশ্বসমাজে টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য রাজনীতি, অর্থনীতি, খনিবিজ্ঞান, তড়িৎবিজ্ঞান, তরঙ্গবিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, কম্পিউটারবিজ্ঞান, পরিবেশবিজ্ঞান, পুষ্টিবিজ্ঞান ইত্যাদি। তাই তারা অনেক ক্ষেত্রে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় পবিত্র কোরান এবং আধুনিক বিজ্ঞানকে। মহান সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর বাইরে ও ভিতরে যে অফুরন্ত সম্পদ রেখে দিয়েছেন মানুষের কল্যাণে এবং সেসবের তথ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বলে দিয়েছেন পবিত্র কোরানে তা তারা করতে পারে না আমাদের ব্যবহার উপযোগী। ব্যবহার করাও অনুচিত মনে করে অনেক সময়।

তারা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে সর্বক্ষেত্রে প্রমাণ করার যোগ্যতা লাভ করে না যে, সকল আধুনিক নিয়মনীতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎস হচ্ছে পবিত্র কোরান। তদুপরি, তারা মেনে নিতে চায় না কওমি মাদ্রাসার হুজুর ব্যতীত অন্য কারো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজে পি.এইচডি. ডিগ্রি লাভকারীদের মতামতের চেয়েও অনেক সময় উত্তম মনে করে তাদের হুজুরগণের মতামত। তাদের অনেকে আবার পৃথক করে দেখেন ধর্ম এবং কর্মকে। মানুষের কল্যাণে কোনকিছু উৎপাদন এবং উদ্ভাবনের মতো পুণ্যকর্মগুলো

সম্পাদনের দায়িত্ব যেন তাদের নয়; কেবল স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া পাপী(?) মুসলমান এবং অমুসলমানদের।

এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থায় বেড়ে ওঠা মানুষগুলো সঙ্গত কারণেই হয়ে ওঠে কর্মবিমুখ। ছোট বেলা থেকে তারা কখনো ভাবতে পারে না যে, পড়ালেখা শেষ করে তাদের হতে হবে কোন পণ্য বা সেবা উৎপাদনের উদ্যোগী বা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী। যাদের দানের টাকায় চলে তাদের এই কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাজীবন তারাও ভাবেন না এমনটি। এইসব মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, আর্থিক সহায়তাকারী এবং সাধারণ মানুষ সবাই মনে করেন মাদ্রাসায় পড়ে হুজুর হবে, কাজ করবে কেন?

একটা বাস্তব উদাহরণ দিই। আমার একজন আত্মীয় বি.এ. পাশ করে নামমাত্র পুঁজি নিয়ে শুরু করে তৈরি পোশাকের ব্যবসা। সে এখন অনেক ধনী। অনেক রকম ব্যবসা তার। যেমন ধর্ম কর্মে সক্রিয় তেমন উদার তার দানের হাত। তার দানের টাকায় চলে একাধিক আবাসিক কওমি মাদ্রাসা ও এতিমখানার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উন্নত জীবনযাপন। তাকে বলেছিলাম, তোমার তো বিদেশে পণ্য রপ্তানির প্রয়োজনে অনেক কার্টন, পলিব্যাগ ও অন্যান্য জিনিস কিনতে হয়। এইসব বা অন্য কোন লাভজনক পণ্য উৎপাদনের জন্য মাদ্রাসা ও এতিমখানাগুলোর পাশে পড়ে থাকা খালি জায়গাগুলোতে ছোট ছোট কারখানা তৈরি করো। তাতে এই শত শত শিক্ষার্থীরা পড়ার অবসরে দিনে এক দুই ঘন্টা করে কাজ শিখতে ও করতে পারবে। এই কাজের একটা পারিশ্রমিক দাও। সেটা থেকে তার খরচ চালাতে বলো। ঘাটতিটা তুমি দান করো। যাতে তারা পড়ার পাশাপশি কাজের দক্ষতা লাভ করবে এবং অপরের দানের হাতের দিকে তাকিয়ে না থেকে আত্মনির্ভশীল হতে শিখবে। হয়তবা বেয়াদবি হবে মনে করে, সে আমার এই প্রস্তাবের উত্তরে মুখ খুলে কিছুই বললো না। কিন্তু বাস্তবে প্রত্যাখ্যান করলো আমার দেওয়া কয়েক বৎসর আগের সেই প্রস্তাব। বোধ করি এইরূপ কাজে সম্মত হবেন না মাদ্রাসার মুফতি বা হুজুরগণ।

উৎপাদনমুখী কাজকর্মের শারীরিক ও মানসিক অযোগ্যতা নিয়ে এইসব মাদ্রাসা থেকে পাশ করে এসে দান গ্রহণের জন্য হাত বাড়ানো ছাড়া আর কী করবে এই শিক্ষিতরা? তাইতো তাদের অধিকাংশই ওস্তাদদের মতই তৈরি করে আরো একটি কওমি মাদ্রাসা ও এতিমখানা। নিজেরা হয়ে যান হুজুর। এতিম শিক্ষার্থীদের নামিয়ে দেন দান-খয়রাত আহরণে। হয়ত নিজের শিক্ষাজীবনে এমনটি করেছিলেন তিনিও। অতি সাধারণ ও দরিদ্র মানুষের বাড়ি থেকে চাল তুলে চলে অধিকাংশ গ্রামের কওমি মাদ্রাসার সেই হুজুরদের খোরাক। কোরবানির পশুর চামড়ার টাকা, জাকাতের টাকা, ফিতরার টাকায় চলে অধিকাংশ এতিমখানার লিল্লাহ্ বোর্ডিং। মসজিদের দানবাক্সের টাকায় চলে অধিকাংশ ইমাম, মোয়াজ্জিন ও খাদেমের বেতন। সাধারনত বিভিন্ন বাসা-বাড়ি থেকে প্রদান করা হয় তাদের খাবার। এতিমদের লিল্লাহ্ বোর্ডিং এর খাবারও খেয়ে থাকে তাদের দেখভালে নিয়োজিত অনেকেই।

ইদানিং অবশ্য শহর ও উপশহরে গড়ে উঠা কিছু কওমি মাদ্রাসায় পড়াশুনা করছে মধ্যবিত্ত পরিবারের দু'একটি সন্তান। যারা পরিশোধ করছে নিজেদের বেতন ও খাওয়া থাকার সামান্য খরচ। তারপরেও আমাদের দেশের প্রায় সকল কওমি মাদ্রাসার উন্নয়ন এবং হুজুরদের বেতন-ভাতার পরিমাণ নির্ভর করছে দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের দান-খয়রাতের টাকার উপর। গ্রামে-গঞ্জে শহরে নগরে দেশে বিদেশে বসবাসকারী যেসকল মানুষের কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে চলছে এ দেশের প্রায় সবকটি এতিমখানা, কওমি মাদ্রাসা ও মসজিদের অধিকাংশ খরচ; তারা কিন্তু এইরূপ কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাগত যোগ্যতার দ্বারা অর্জন করেন নাই এমন পরিমাণ অর্থ উপার্জনের কর্মক্ষমতা, যা দিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে করতে পারেন দান-খয়রাত।

আমার উল্লিখিত ধনী দানশীল আত্মীয় কিন্তু বি.এ. পাশ। তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোতে যারা কাজ করে তারা সবাই টেকনিক্যাল বা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। অনেক টাকা বেতনের বড় বস এম.বি.এ. পাশ। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, আমরা আমাদের দান-খয়রাতের টাকায় পরিচালিত কওমি মাদ্রাসায় লাখ লাখ সন্তানকে দিচ্ছি এমনই উত্তম শিক্ষাগত যোগ্যতা যা নিয়ে তারা কাজ পায় না আমাদের প্রতিষ্ঠানেই! আমি জানি না অধিক ছোয়াবের আশায় দান-খয়রাত করে কওমি মাদ্রাসায় পড়িয়ে সুস্থ-সবল অবুঝ শিশুগুলোকে আমরা যারা করে দিচ্ছি কর্ম অক্ষম বা অদক্ষ তার কী পুরস্কার আল্লাহ আমাদের দিবেন।

আমাদের নবীজী তো হাত পাততে বলেন নি, কাজ করে খেতে বলেছেন। কাজ করতে হলে তো, ধর্মীয় জ্ঞান লাভের পাশাপাশি কোন না কোন কাজের যোগ্যতা লাভ করতেই হবে। কেউই পণ্য উৎপাদন না করলে কী নিয়ে করা যাবে নবীজীর প্রিয় ব্যবসা বাণিজ্য? যেসব মা-বাবা একটা সন্তানকে মাদ্রসায় এবং একটা সন্তানকে স্কুলে পড়ান, তারা কি একটাকে বেহেস্তে

আরেটাকে দোজোখে পাঠাতে চাচ্ছেন? এমন কিছু মা-বাবা আছেন যারা এই ভেবে সকল সন্তানকেই কওমি মাদ্রাসায় পড়াচ্ছেন যে, আমার তো সম্পদের অভাব নেই সন্তানদের কিছুই করে খেতে হবে না। তারা কি ভেবেছেন যে, ক্রমবর্ধমান কর্মবিমুখ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগভাগি হতে হতে নগণ্য হয়ে যাবে এই সম্পদ। তখন তাদেরকে হয় করতে হবে কর্ম, নয় হাত বাড়াতে হবে কর্মঠের দিকে।

একটা দেশের সবাই যদি এইরূপ কওমি মাদ্রাসায় পড়া এবং পড়ানোর কাজ করে তো হুজুরগণের এবং মা-বোন-বিবি-কন্যাদের চিকিৎসার জন্য পুরুষ এবং মহিলা ডাক্তার ও নার্স পাবো কোথায়? ঔষধ বানাবে কে? সুন্দর সুন্দর মসজিদ মাদ্রাসা ও বাড়িঘর বানানোর ইঞ্জিনিয়ার পাবো কোথায়? কে বানাবে ফ্যান, ফ্রিজ, এসি, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন সেট? ফ্যানের বাতাস আর এসির ঠান্ডা খাওয়ার জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র বানাবে বা চালাবে কারা? ওয়াজ করার জন্য মাইক বানাবে কে? চাষাবাদ করার লোক আসবে কোথা থেকে? কে উদ্ভাবন করবে অধিক ফসল উৎপাদনের কৌশল? কারা আবিষ্কার করবে কাপড় তৈরির সূতা? কারা তৈরি করবে শরীর ও পোশাক পাক-ছাফ করার সাবান? কে আবিষ্কার করবে মাটির ঢিলার বিকল্প টয়লেট পেপার? কে উদ্ভাবন ও ব্যবহার উপযোগী করবে আল্লাহ তাআলার দেওয়া খনিজ সম্পদ, পানিসম্পদ, বায়ুসম্পদ, বেতার তরঙ্গ আর সৌরশক্তি? কারা তৈরি ও পরিচালনা করবে দ্রুতগামী যানবাহন? কারা করবে এইরূপ দান-খয়রাত?

হুজুরগণ তো দান-খয়রাত নেয়, দেয় না সাধারণত! আমাদের দেশটাকে যদি তুলনা করি দু'একটি সাধারণ পরিবারের সাথে; তো কী দেখতে পারবো আমরা? যে পরিবারের একজন উপার্জনক্ষম আর তিনজন অক্ষম সে পরিবারের সচ্ছলতা এবং অগ্রগতি কম। যে পরিবারের দুইজন উপার্জনক্ষম আর দুইজন অক্ষম সে পরিবারের সচ্ছলতা ও অগ্রগতি মোটামুটি। যে পরিবারের তিনজন উপার্জনক্ষম আর একজন অক্ষম সে পরিবারের সচ্ছলতা ও অগ্রগতি ভালো। যে পরিবারের চারজন সবাই উপার্জনক্ষম সে পরিবারের সচ্ছলতা ও অগ্রগতি উত্তম। আবার যে পরিবারের চারজন সবাই অধিক উপার্জনক্ষম সে পরিবারের সচ্ছলতা ও অগ্রগতি অতি উত্তম। ঠিক এমনিভাবে আমাদের দেশের কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষিত উৎপাদন ও উপার্জন অক্ষম লাখ লাখ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন করছে প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষেরা। তদুপরি যুক্তিযুক্ত কারণে উপার্জনে অক্ষম অশিক্ষিত, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ ও শিশুদের দায়ও তো নিতে হচ্ছে তাদেরকেই। সুস্থ সবল সবাই কমর্ক্ষম হলে, কর্মে নিয়োজিত হলে নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাবে আমাদের দেশের সচ্ছলতা ও অগ্রগতি এবং হ্রাস পাবে পরনির্ভরতা ও পরাধীনতা।

ধর্মের সাথে তো কর্মের কোন বিরোধ নেই। কর্মে আছে সম্মান, ভিক্ষায় আছে অপমান। দান, সাহায্য, ভিক্ষার মাধ্যমে অর্থ আয় করা গেলেও এসব কোন কর্ম নয়। যিনি একই সাথে ধর্ম এবং কর্ম দুটোই সম্পাদন করেন তিনিই তো উত্তম। যার ধর্মীয় মূল্যবোধ আছে তার কর্মে কল্যাণ আছে। যার বিবেক নেই, ধর্মীয় মূল্যবোধ নেই, তার কর্মে কল্যাণ নেই। সে ফসলে বিষ দেয়, খাবারে ভেজাল দেয়, কাজে ফাঁকি দেয়, অন্যকে ঠকায়, মানুষকে ধোঁকা দেয়, অত্যাচার করে, দুঃশাসন করে। যে সত্যিকার ধর্মপ্রাণ, সে এমনসব অপকর্ম করতে পারে না। পরিবার, রাষ্ট্র ও সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা যেমন প্রয়োজন; তেমনি সুস্থ, সবল, সচ্ছল ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে মুসলমানের মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন কর্মমুখী ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা। নৈতিক ও ধর্মীয় এবং কর্মমুখী ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই গুটানো সম্ভব মুসলমানদের দান গ্রহণের হাত। নিরসন করা সম্ভব দাতাদের কূটকৌশলে সৃষ্ট আমাদের ঐক্যের ফাটল।

আত্মনির্ভশীলতার অভাবই আমাদের অনৈক্য ও অশান্তির প্রধান কারণ। তাই নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী ও বিজ্ঞানমনস্ক করা জরুরি আমাদের দেশের কওমি মাদ্রসার শিক্ষাব্যবস্থাকে। উর্দু শব্দ মাদ্রাসা-র অর্থ হচ্ছে শিক্ষালয়। মানুষের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণ সাধনের উপযোগী সকল শিক্ষাইতো দিতে হবে আদর্শ শিক্ষালয়ে। কর্মমুখী ও বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা যে সকল মানুষকেই ধর্মবিমুখ করে না তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে বিশ্বব্যাপী তাবলীগ জামাতের সাথে সম্পৃক্ত লক্ষ লক্ষ মুসলমান শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনবিদ, কৃষিবিদ, বিজ্ঞানী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত সচ্ছল ও অত্মনির্ভরশীল মানুষ।

মো. রহমত উল্লাহ্

অধ্যক্ষ, কিশলয় বালিকা বিদ্যালয় এবং কলেজ

মো: ইয়াসিন আরাফাত

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কতটুকু কার্যকর হচ্ছে?

প্রশিক্ষণ আমরা কেন নিই? উত্তর খুব সাধারণ, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য। পরবর্তী কালে সেই দক্ষতা পেশাগত বা আত্মন্নোয়নের কাজে ব্যবহার করি। আমরা কোন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ নিই? এর উত্তরও কোনো জটিল বিজ্ঞান নয়। যে সকল বিষয়ে আমরা নিজেদেরকে দক্ষ করে তোলার প্রয়োজন মনে করি বা যে বিষয়টি আমাকে পেশাগত ক্ষেত্রে নানান সুবিধা দিতে সক্ষম, সাধারণত সে সকল বিষয়ে আমরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। আবার, কোনো সংস্থা তার কর্মীদের এক বা একাধিক ক্ষেত্রে দক্ষ করে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারে। প্রশিক্ষণের বিষয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিদের শিখন চাহিদার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

বাংলাদেশের বিদ্যালয় (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) পর্যায়ের প্রশিক্ষণের বিষয় সবসময় শিক্ষকদের চাহিদা-নির্ভর নয়। সহজ কথায়, শিক্ষকদেরকে যে সকল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, সে সকল প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তারা নিজেরা অনুভব করেন কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ। এ কথা বলার কোন অবকাশ নেই যে, এ সকল প্রশিক্ষণ তাদের প্রয়োজন নেই, বরং কার্যকর পাঠ পরিচালনা তথা গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রদেয় শিক্ষক প্রশিক্ষণের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা পাঠ পরিচালনা এবং শিক্ষার্থীর শিখন সহায়তার কাজে কতটুকু ব্যবহৃত হচ্ছে- তা এক বিরাট প্রশ্ন।

গত দেড় দশকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়, বিশেষত বিদ্যালয় পর্যায়ে, বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে- গ্রেডিং সিস্টেম পরিবর্তন, পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষার সূত্রপাত, সৃজনশীল পদ্ধতির প্রণয়ন, কমিউনিকেটিভ ইংলিশ চালু ইত্যাদি। তাছাড়া পাঠকে আনন্দদায়ক ও শিখনকে টেকসই করার উদ্দেশ্যে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম-ও নবতর একটি সংযোজন। এ সকল পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য শিক্ষার্থীর শিখন যাতে কার্যকর হয় এবং সে যাতে তার শিখন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারে। যেহেতু শিক্ষা সম্পর্কিত সকল উদ্যোগকে শ্রেণিকক্ষে নিয়ে যাওয়ার অদ্বিতীয় বাহক হচ্ছেন শিক্ষক, তাই এ সকল পরিবর্তনের বেশির ভাগের সঙ্গেই জড়িয়ে ছিল শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকরা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ, শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ, লিডারশিপ প্রশিক্ষণ, অ্যাকাডেমিক সুপারভিশন প্রশিক্ষণ, সাব-ক্লাস্টার

প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এর পাশাপাশি নিয়মিত ডিপিএড/সিইনএড ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ তো আছেই, যা সকল শিক্ষকের জন্যই বাধ্যতামূলক। যদিও উল্লিখিত সব প্রশিক্ষণের লক্ষ্যদল এক নয়। এখানেই শেষ নয়। অনেক উন্নয়ন সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করেন শিক্ষকরা। বলা বাহুল্য, প্রশিক্ষণকালীন সময়টুকু শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের বাহিরে অবস্থান করেন। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় বাৎসরিক সংযোগ ঘন্টা (যে সময়টুকু শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত থাকে) গড়পড়তা ৫৪০-৬০০ ঘণ্টা, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের প্রায় অর্ধেক। বিভিন্ন প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের অংশ গ্রহণের কারণে এই সময় আরও কমে যায়। এর ফলে একদিকে যেমন প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত দক্ষতা শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের সময় শিক্ষকরা কম পাচ্ছেন, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদেরও শিখন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সময় কমে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, তা নির্ধারণ করেন কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নীতি নির্ধারকগণ। এতে হয়তো দোষের কিছু নেই। কিন্তু যারা এই প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থী তারা নিজেরা যদি প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করে অন্য কোনো বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তাহলে প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে শিক্ষকরা কেবল নির্দিষ্ট কিছু জ্ঞান ও দক্ষতাই অর্জন করেন না, নির্ধারিত কিছু আর্থিক সুবিধারও (সম্মানী, যাতায়াত খরচ, প্রশিক্ষণকালীন আবাসন ও পানাহার খরচ ইত্যাদি) অধিকারী হন। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, প্রশিক্ষণে শিক্ষকগণ শিখতেই আসেন। কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে এটাই প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য- এ কথা বললে সত্যের আপলাপ হবে। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, অনেকের ক্ষেত্রেই শেখার চেয়ে অন্য উদ্দেশ্য প্রধান হয়ে ওঠে। এ রকমও দেখা যায়, প্রশিক্ষণে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কোনো একজন শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো, তিনি প্রশিক্ষণের বিষয়ের চেয়ে আর্থিক সুবিধা সম্পর্কে জানতে বেশি উৎসাহী। দুঃখের বিষয় হলো, এই ধরনের উৎসাহী শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। সরকারি বা বেসরকারি, যারাই প্রশিক্ষণ আয়োজন করেন, চেষ্টা করেন বরাদ্দকৃত বাজেটের মধ্যে সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করতে। তথাপি, প্রশিক্ষণে এসে নানান সুযোগ-সুবিধা নিয়ে শিক্ষকদেরকে অভিযোগ করতে দেখা যায়।

প্রশিক্ষণের জ্ঞান ও দক্ষতা দ্বারা শিক্ষকেরাই লাভবান হন, নিজের পেশাগত ভূমিকাটা আরও কার্যকরভাবে পালন করতে পারেন, জানার ক্ষেত্র বিকশিত হয়। তাহলে এ ধরনের প্রশিক্ষণের খরচ তো শিক্ষকদের নিজেদের বহন করার কথা। পৃথিবীতে খুব কম দেশই আছে, যেখানে শিক্ষকদেরকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে উপরন্তু সম্মানী ও অন্যান্য খরচ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে তা করা হয় বলে একে নেতিবাচক বলার কোনো সুযোগ হয়তো নেই। কিন্তু এ বিষয়টির কারণে যদি শিক্ষকদের মনোযোগ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু থেকে অন্য দিকে ধাবিত হয়, সেটা কারও জন্যই মঙ্গলজনক নয়। এই মানসিকতা নিয়ে প্রশিক্ষণে আসা শিক্ষকরা কতটুকু জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন তা প্রশ্নসাপেক্ষ, আর প্রশিক্ষণে প্রদেয় দক্ষতা শ্রেণিকক্ষে নিয়ে যাওয়া তো আকাশকুসুম ব্যাপার।

শিক্ষকদের নতুন কিছু শেখা বা নতুন কিছু করার অনিচ্ছাও এক্ষেত্রে বড় অনুঘটক। এটা অনুমিত যে, বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকতা পেশায় যারা আসেন, তারা 'বাই চয়েস' নয় বরং 'বাই চান্স' আসেন। এতে করে একটা বয়সের পর ক্যারিয়ারের উন্নতি কিংবা উদ্ভাবনী কিছু করার প্রতি অনেকেরই অনীহা দেখা যায়। 'যেভাবে চলছে চলুক' এমন চিন্তাধারা নিয়েই তারা কষ্টকর পাঠ পরিচালনাটুকু সেই একই নিয়মে করে যান। এই দলটি প্রশিক্ষণ থেকে জ্ঞান ও দক্ষতা কিছু অর্জন করলেও পাঠ পরিচালনায় তা প্রয়োগের ধারে-কাছে ঘেঁষেন না।

একটি ব্যাপার উল্লেখ্য যে, সব শিক্ষকই যে সমভাবে প্রশিক্ষণের সুযোগ পান এমন নয়। কিছু প্রশিক্ষণ আছে যা সকল শিক্ষকের জন্য বাধ্যতামূলক। আবার কিছু প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের একজন বা দু'জন শিক্ষক পেয়ে থাকেন। বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত বেশির ভাগ প্রশিক্ষণের প্রকৃতিই এমন। এক্ষেত্রে কারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন তা নির্বাচন বা মনোনয়নের দায়িত্ব থাকে ক্ষেত্রবিশেষে প্রধান শিক্ষক বা উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তার ওপর। এক্ষেত্রে সে শিক্ষকরাই সুযোগ পান যারা পাঠ পরিচালনায় বেশি আন্তরিক ও দক্ষ অথবা যাদের সঙ্গে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সুসম্পর্ক আছে। এই প্রবণতার ফল হিসেবে দেখা যায়, কোনো কোনো শিক্ষক একাধারে অনেক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বা পাচ্ছেন, আর কোনো শিক্ষক বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ ব্যতীত আর কোনো প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ পান নি। এই অবস্থা দুটি আঙ্গিক থেকে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। একদল প্রশিক্ষণ না পেয়ে দক্ষতা হারাচ্ছে দিন দিন, আরেক দল নানান দক্ষতা অর্জন করলেও দীর্ঘ সময় প্রশিক্ষণে ব্যস্ত থাকার দরুন তার দক্ষতার সুফল শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে না।

এত এত প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নততর সুযোগ-সুবিধা, নতুন নতুন পদ্ধতি ও কলাকৌশল, তথাপি এখনও মধ্যযুগীয় পদ্ধতির পাঠ পরিচালনা বড় এক রহস্য! বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে যে কোনো ভূমিকায় জড়িত ব্যক্তিমাত্রই জানেন, বেশির ভাগ শিক্ষকই এখনও গতানুগতিক পদ্ধতিতেই পাঠ পরিচালনা করেন। শিক্ষার্থীকে মুখস্থপ্রবণ করে তোলা, প্রশ্নকে অনুৎসাহিত করা, শিখনের চেয়ে পরীক্ষার সাফল্যকে গুরুত্ব দেয়া, পাঠ পরিকল্পনাকে আমলে না নেয়া, শিখন উপকরণ ব্যবহার না করা ইত্যাদি শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার খুবই সাধারণ চিত্র। উপরের মহল (যেমন- শিক্ষা কর্মকর্তা) থেকে কেউ পাঠ পর্যবেক্ষণে গেলে শিক্ষকদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার অবস্থা হয়। ঐ পাঠে তারা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতাসমূহ প্রয়োগের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন এবং তাৎক্ষণিক একটি পাঠ পরিকল্পনাও এনে হাজির করেন। তবে তাদের পাঠ পরিচালনা দেখে সহজেই বোধগম্য হয় যে, এই পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনায় তারা অভ্যস্ত নন। এর ফলটাও আমরা হাতেনাতে পাচ্ছি। এ+ এর সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চললেও বাড়ছে না শিক্ষার গুণগত মান, শতকরা ৯০ ভাগের ওপরে শিক্ষার্থী পাশ করলেও, সত্যিকার অর্থে শিখছে ক'জন?

তাহলে সমাধান কী? একটি সমাধান হতে পারে অনলাইন প্রশিক্ষণ। দেশি-বিদেশি অনেক উন্নয়ন সংস্থারই অনলাইন প্রশিক্ষণের সুযোগ আছে। বাংলাদেশে এই সুযোগ যদি সরকারি উদ্যোগে করা সম্ভব হয় তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে। এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) ইতোমধ্যে 'মুক্তপাঠ'-এর মাধ্যমে অনলাইন প্রশিক্ষণের একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। এখন প্রয়োজন অনলাইন প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের অভ্যস্ত করে তোলা। এতে করে শিক্ষকরা তাদের চাহিদামাফিক সুবিধাজনক সময়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের সংযোগ ঘন্টার ওপর কোন নেতিবাচক প্রভাবও পড়বে না। পাশাপাশি, এত শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানে যে বৃহৎ পরিকল্পনা আর আয়োজনের দরকার হয়, তারও প্রয়োজন হবে না। আর প্রশিক্ষণের মূল বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে অতি উৎসাহের ব্যাপারও থাকছে না।

যতদিন পর্যন্ত অনলাইন প্রশিক্ষণের আওতায় শিক্ষকদের আনা সম্ভব না হচ্ছে, ততদিন ফেস-টু-ফেস প্রশিক্ষণই সম্ভবত উপযুক্ত বিকল্প। সেক্ষেত্রে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যকীয়। প্রাথমিক পর্যায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা তুলনামূলক শক্তিশালী, তবে কার্যকারিতার দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে। প্রাথমিকের মনিটরিং কার্যকর করার পাশাপাশি মাধ্যমিক পর্যায়েও সুষ্ঠু পরিকল্পনাপ্রসূত মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। মনিটরিং হতে হবে প্রশিক্ষণে প্রদত্ত জ্ঞান ও দক্ষতা-নির্ভর, অর্থাৎ প্রশিক্ষণে যে জ্ঞান বা দক্ষতা শিক্ষকরা অর্জন করেছেন, তা পাঠ পরিচালনায় ব্যবহার করছেন কিনা তা যাচাই করতে হবে। আর সে জন্য যিনি মনিটরিং-এর দায়িত্বে থাকবেন, তাঁর শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রদত্ত জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে। একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, বাংলাদেশে একটি সাধারণ চর্চা হচ্ছে, মনিটরিং-এর ব্যাপারে শিক্ষকরা আগেই জানতে পারেন। এর ফলে তারা অন্য পাঠে যা-ই করেন না কেন, মনিটরিং-এর দিন পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আসেন। এতে করে শিক্ষকরা অন্য সময়ে কিভাবে পাঠ পরিচালনা করেন, তা মনিটরেরা জানতে পারেন না। এ জন্য মনিটরিং-এর দিন বা সময় সম্পর্কে পূর্বেই শিক্ষকদের অবহিত না করাই সমীচীন।

একজন শিশু বা শিক্ষার্থীর মনন, চাহিদা, সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে যারা সবচেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল, তাদের মধ্যে শিক্ষকদের স্থান বাবা-মা'র পরেই থাকবে নিঃসন্দেহে। শিক্ষক যদি তাঁর শিক্ষার্থীকে সত্যিকার অর্থে শিখনে সহায়তা করতে চান, তাহলে প্রশিক্ষণের চেয়েও বেশি জরুরি তাঁর আন্তরিকতা। এই একটি জিনিস দিয়েই শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীকে বুঝতে পারবেন এবং তার উপযোগী করে পাঠ পরিচালনা করতে পারবেন। তবে প্রশিক্ষণ শিক্ষকের কাজকে সুশৃঙ্খল ও অধিকতর কার্যকর করে তোলে, নতুন নতুন পদ্ধতি ও কলাকৌশল সম্পর্কে ধারণা দেয়। কোনো প্রশিক্ষণই ফলপ্রসূ হবে না, যদি শিক্ষক আন্তরিক না হন। সন্দেহ নেই শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। যদিও সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদার প্রশ্নে অনেকের ভিন্ন ভিন্ন অভিমত থাকতে পারে। তথাপি তাঁদের হাতেই জাতির মেরুদণ্ডটি গড়ার দায়িত্ব ন্যস্ত। অন্য সব বিতর্ক ও জটিল বিষয়াদি পাশে রেখে যদি তাঁরা জাতি গঠনে তাঁদের ভূমিকাটির গুরুত্ব বুঝতে পারেন তবেই কল্যাণ, সকলের।

মোঃ ইয়াসিন আরাফাত
অফিসার - আইসিটি ইন এডুকেশন
রিড প্রকল্প, শিক্ষা সেক্টর
সেভ দ্য চিলড্রেন, বাংলাদেশ

এ এম রাশিদুজ্জামান খান

তাঁর তরে একটি সাজানো বাগান চাই

শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টির প্রত্যয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষর করেছে এবং সরকারী ও বেসরকারী নানা উদ্যোগের সমন্বয়ে শিশুদের সুরক্ষা ও উন্নয়নে কাজ করে আসছে। কিন্তু বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে একদিকে যেমন শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, অন্যদিকে নতুন করে হাজারো শিশু তাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া শিশু নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশের পর জনমনে প্রশ্ন হচ্ছে শিশু অধিকার রক্ষা, শিশুদের জন্য আদর্শ বর্তমান ও সোনালি ভবিষ্যৎ নির্মাণে আমরা কী ব্যর্থ?

গণমাধ্যমে প্রতিদিনই শিশু নির্যাতন ও খুনের নির্মম আর বীভৎস সব সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। শিশুদের প্রতি বর্বরতা, নৃশংসতার মাত্রা দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। রাজনের বর্বর হত্যাকান্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই সামনে এসে হাজির হচ্ছে রাকিবের সঙ্গে সংঘটিত নৃশংসতার কাহিনী। আর একদিন যেতে না যেতেই আমাদের বরগুনার রবিউলের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা জানতে হচ্ছে।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য অনুযায়ী, গত সাড়ে তিন বছরে ৯৬৮ শিশুকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০১২ সালে ২০৯ জন, ২০১৩ সালে ২১৮ জন এবং ২০১৪ সালে ৩৫০ জন। শুধু জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত-১৯১ জন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে এবং ৯৬ জন শিশু ধর্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় একজন শিশু হত্যা এবং ধর্ষণের শিকার হয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) প্রকাশিত ত্রৈমাসিক বুলেটিনে উল্লেখিত পরিসংখ্যান থেকে শিশু নির্যাতনের যে চিত্র পাওয়া যায়, সেখানে দেখা যায় যে গত জানুয়ারি ২০১৪ থেকে জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত-৪০৩ জন শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। অন্যদিকে ১৬৪ জন শিশু নির্যাতনের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে। অথচ সংঘটিত অপরাধের ঘটনায় মাত্র ১৩ শতাংশ ক্ষেত্রে মামলা হয়েছে, বাকি ঘটনার কোনটির ক্ষেত্রেই মামলা হয় নি। ৮৭ শতাংশ ঘটনার মামলা না হওয়া কি ইঙ্গিত করে যে, ভুক্তভোগী শিশুদের পরিবার আইনী প্রতিকার লাভের বিষয়ে চরমভাবে নিরুৎসাহিত?

এসব পরিসংখ্যান আঁতকে ওঠার মতোই। এসব ঘটনার নৃশংস প্রকৃতি এবং পুনরাবৃত্তি এটাই প্রমাণ করে যে, আমাদের দেশে শিশুরা মোটেও সুরক্ষিত নয়। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিশু অধিকার প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে, এদেশের পরিবারগুলোর

নানা দুরাবস্থার কারণে তাদের সন্তানগণ বিবিধ অধিকার ভোগ করার সুযোগ পায় না। বেড়ে ওঠার প্রতিটি পর্যায়ে শিশুরা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা পদ্ধতিগত নিগ্রহের ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

একজন মানুষ সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠার জন্য, তার মধ্যে মানবিক গুণাবলির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যে ধরনের পরিবেশ প্রয়োজন, সবার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগের কোনোটাই আমাদের শিশুরা পরিপূর্ণভাবে পাচ্ছে না। অজস্র 'নেই'কে আঁকড়ে ধরেই বড় হয় আমাদের দেশের শিশুদের এক বিরাট অংশ। অনেকে আবার শৈশব হারিয়ে পরিণত হয় শিশু শ্রমিকে।

বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা কত তা নিয়ে বিভ্রান্তি থাকলেও অনুমান করা যায় তাদের সংখ্যা ৫০ লক্ষেরও বেশী। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এবং ইউনিসেফ পরিচালিত এক জরিপ অনুযায়ী বিভাগীয় শহরাঞ্চলে প্রায় ৩০১, পুরাতন জেলা শহরে ২০১, নতুন জেলা শহরে ১৮৭, থানা সদরে ১৩৩, পার্বত্য এলাকায় ২৩ এবং পল্লী এলাকায় ৯৪ ধরনের কাজে শিশুরা শ্রম দিচ্ছে।

ঠিকানাবিহীন পথশিশুদের অবস্থা আরো করুণ। বসবাসের জন্য নেই যথাযথ গৃহ, নেই তিন বেলা খাবার, নেই স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ। অর্থাৎ একজন শিশুকে মর্যাদাপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ আমরা খুব কম দিতে পারছি।

শিশু অধিকার রক্ষা, শিশুশ্রম বিলোপের বিষয়টি কিন্তু সব শিশুর জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার মধ্যেই নিহিত। কেবল শিক্ষা নিশ্চিত করা নয়, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে বিদ্যালয়ে গিয়েও সেই শিশুর জীবনমান উন্নত হয় না। এখনও দেখা যাচ্ছে, যে সংখ্যক শিশু বিদ্যালয়ে যাচ্ছে তারা সবাই লিখতে পারে না। এক হিসাবে দেখা যায়, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের ৭০ শতাংশই ঠিকমত পড়তে, লিখতে ও গুণতে পারে না। এসব শিশু তার শিক্ষাকে তাহলে কীভাবে জীবনমান উন্নয়নে কাজে লাগাবে?

বিদ্যালয়ে গিয়েও ভালো শিক্ষা না পাওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে প্রধান কারণগুলো হচ্ছে ভালো শিক্ষক ও উপযুক্ত শিক্ষা উপকরণের অভাব। আবার শিশুর পরিবারে থাকা-খাওয়ার কী পরিস্থিতি, সেটাও তার শিক্ষার ওপর প্রভাব ফেলছে। এজন্য বিদ্যালয়গামী সব শিশুর শিক্ষার ভার, ভালো শিক্ষক জোগাড় করার ভার, শিক্ষা উপকরণের ভার, এমনকি শিশুর খাদ্যের ভারও নিতে হবে সমাজ, রাষ্ট্র তথা বিশ্ব সম্প্রদায়কে।

এখন বিশ্বব্যাপী শিক্ষা খাতে যা ব্যয় হয়, তার থেকে বছরে অতিরিক্ত ২২শ কোটি ডলার ব্যয় করা গেলেই সব শিশুর মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা যাবে। আর এই অর্থ হচ্ছে বিশ্বে যে সামরিক ব্যয় হয়, তার সাড়ে চার দিনের ব্যয়ের সমান। মাত্র সাড়ে চার দিনের সামরিক ব্যয় দিয়ে গোটা বছরের শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ যখন প্রণীত হয় তখন পৃথিবীর শিশুরা ছিল আরো অধিকারবঞ্চিত। দেশে দেশে মানব প্রেমিকরা এ কারণে ব্যথিত হয়েছেন। দেশে দেশে শিশু- কল্যাণে নিয়োজিত সংস্থাসমূহ তখনও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত। জাতিসংঘ শিশু অধিকার ঘোষণা এ সবেরই ফল।

এমডিজি'র পর বর্তমান বিশ্ব এসডিজি বা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ শুরু করতে যাচ্ছে। কিন্তু শিশুদের বিপন্ন রেখে রাষ্ট্রব্যবস্থা, সামরিক সামর্থ্য, নাগরিক অধিকার যত শক্তিশালীই করি, তা টেকসই হবে না। গবেষণায় দেখা গেছে যে, সামাজিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সাথে একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্পর্ক আছে। এটি সার্বজনীন এবং সারা বিশ্বের চিত্রটি একই রকম।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এদেশে সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে বিভিন্ন রকম সামাজিক ইস্যুতে পরিস্থিতির উন্নতি ও রক্ষা করার জন্য বেশী বিনিয়োগের প্রয়োজন। শিশুদের অবস্থার উন্নতির জন্য শিশু অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা বা শিশুশ্রম থেকে শিশুদের সরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। তাছাড়া তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে ত্বরান্বিত করা গেলে সেটি সাধারণ মানুষের আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করবে, ফলে কমিউনিটি পর্যায়ে শিশু অধিকার বাস্তবায়ন এবং তার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা অনেক সহজ হবে। আর এতেই নিশ্চিত হতে পারে টেকসই উন্নয়ন।

এ এম রাশিদুজ্জামান খান

উন্নয়ন কর্মী

সবার জন্য শিক্ষার নিশ্চয়তা চাই
চাই শিশুদের স্কুলে ভর্তি এবং শিক্ষা সমাপনে সকলের অংশগ্রহণ

শিক্ষা শিশুর অধিকার। সেই অধিকার বাস্তবায়নে রাষ্ট্র যেমন কাজ করছে তেমনি ভাবে বেসরকার উন্নয়ন সংস্থাগুলিসহ অন্যরাও কাজ করছে। বাংলাদেশের অনেক শিশু বিভিন্ন কারণে বিদ্যালয়ে যেতে পারে না আবার অনেকে ঝরেও যায়। দরিদ্রতা, বাল্য বিবাহ, যৌন হয়রানি, অভিভাবকদের অসচেতনতা ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়ার যে পরিসংখ্যান আমাদের কাছে রয়েছে বাস্তবে তার তুলনায় ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশী। ঝরে পড়া রোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এসএমসি, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং এলাকাবাসীকে সচেতন করতে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রতি বছর শিক্ষা বিষয়ক ক্যাম্পেইনের আয়োজন করে। গণসাক্ষরতা অভিযান এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ ও সচেতনতা বিকাশী কাজে জনসমাজকে সচেতন ও আলোকিত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধারা ও তার প্রভাবকেও বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করে।

'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজিস্)' ও 'সবার জন্য শিক্ষা (ইএফএ)' ঘোষণার ১৫ বছর পূর্তির পর এবার আসলো আমাদের সামনে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজিস্)। এসডিজিতে মোট ১৭টি লক্ষ্য রয়েছে যার মধ্যে ৪নং গোলটি শিক্ষা সংক্রান্ত। মানসম্মত, একীভূত, সমতাভিত্তিক ও জীবনব্যাপী শিক্ষাকে যেখানে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং টার্গেটগুলো এর উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। আমাদের দেশ শিক্ষায় অনেক সাফল্য অর্জন করেছে, কিন্তু এখনো আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন না করা এবং সর্বোপরি মানসম্মত শিক্ষা। বিদ্যালয় গমনোপযোগী প্রায় শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা সম্ভব হলেও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায় ঝরে পড়ার হার প্রায় ২২%। উপর্যুক্ত বিষয় বিবেচনা করে এবং শিশুদের স্কুলে শতভাগ ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান স্থানীয় পর্যায়ে ডিসেম্বর ২০১৫ ও জানুয়ারি ২০১৬ মাসে ৩০টি রিক্সা প্লেট র‍্যালী, ৯০টি উঠান বৈঠক ও ৮টি যাত্রা পালা আয়োজন করে ।

রিক্সা প্লেট ক্যাম্পেইন

রিক্সা আমাদের দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত বাহন। এই বাহন আমাদের সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের শহরে ও পল্লী অঞ্চলে এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা। যেকোন উন্নয়ন কর্মকান্ডের মৌলিক বিষয়গুলো রিক্সা র‍্যালীর মাধ্যমে জনগণের কাছে খুব সহজেই তুলে ধরা সম্ভব। আর তাই দেশের ৭টি বিভাগের ৩০টি জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ডিসেম্বর ২০১৫ ও জানুয়ারি ২০১৬ মাসে শিশুদের স্কুলে শতভাগ ভর্তিকরণ, ঝরে পড়া রোধ করা ও শিক্ষা সমাপ্তিকরণের বিষয়ে ৩০ টি রিক্সা প্লেট ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হয়। এই সকল জেলা/উপজেলা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসকল এলাকায় শিক্ষার হার কম ও ঝরে পড়ার হার বেশী, সেসকল অঞ্চলের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই র‍্যালীতে যেসব রিক্সা অংশগ্রহণ করছে সেসব রিক্সার পিছনে সবার জন্য শিক্ষা অর্জনের বিভিন্ন বার্তা লিখে বাদ্য-

বাজনার মাধ্যমে সেই বার্তাগুলো জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়। র‍্যালীতে সরকারি কর্মকর্তা, বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন, শিক্ষক সমিতি, গণমাধ্যম প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। ৩০টি র‍্যালীতে ২৬৪০ জন পুরুষ, ২০১৮ জন মহিলা, ১০০৮ জন বালক, ৯১০ জন বালিকাসহ মোট ৬৫৭৬ জন অংশ গ্রহণ করে।

উঠান বৈঠক

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগই গ্রামে বাস করে। গ্রামে বসবাসরত এই মানুষের মধ্যে উঠান বৈঠক অত্যন্ত পরিচিত একটি দেশজ যোগাযোগ মাধ্যম।

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা, পছন্দ অপছন্দ, সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সহজে ধারণা পাওয়া যায়। এই বিষয়সমূহের ওপর গুরুত্ব দিয়ে গণসাক্ষরতা অভিযান শিশুদের স্কুলে শতভাগ ভর্তিকরণ, ঝরে পড়া রোধ করা ও শিক্ষা সমাপ্তিকরণের বিষয়ে তৃর্ণমূল পর্যায়ের সমস্যাগুলো সবার সামনে তুলে ধরা ও শিক্ষাক্ষেত্রে শতভাগ শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য দেশের ৩০টি স্থানে ৯০টি উঠান বৈঠক আয়োজন করে।

স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিটি সংস্থা তিনটি করে উঠান বৈঠক আয়োজন করে। প্রতিটি উঠান বৈঠকে ২৫-৩৫ জন অংশগ্রহণ করে। স্থানীয় পর্যায়ের একজন উপস্থাপক এই উঠান বৈঠক পরিচালনা করেন। আয়োজক সংস্থা পরবর্তী কালে (বছর শেষে) কত জন শিশু এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্কুলে ভর্তি হয়েছে ও ঝরে পড়ার হার কতটা কমেছে তা উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে তথ্য নিয়ে রিপোর্ট করবেন । ৯০ টি উঠান বৈঠকে ৬২৮ জন পুরুষ, ১৩২২ জন মহিলা, ৩৭১ জন বালক ও ৬২২ জন বালিকাসহ মোট ২৯৪৩ জন অংশগ্রহণ করে।

যাত্রা শিল্প

যাত্রা লোকশিল্পের ঐতিহ্যবাহী বাহক। আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান ঐতিহ্য হিসেবে যাত্রা শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় বিনোদন মাধ্যম। যেকোন উন্নয়ন কর্মকান্ডের মৌলিক বিষয়গুলো রসাত্মকভাবে এই মাধ্যমে তুলে ধরা যায়। এ কারণে গণসাক্ষরতা অভিযান তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষা উন্নয়নে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে সহজতম কৌশল সর্ম্পকে ধারণা দেওয়ার জন্য জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে আমাদের দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যাত্রা শিল্পের গুরুত্ব বিবেচনা করে 'সবার জন্য শিক্ষা' অর্জনের উপর বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ২টি ও ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে ৬টি যাত্রা পালা মঞ্চায়ন করে। প্রতিটি যাত্রা পালায় প্রায় ৩০০০ থেকে ৫০০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় পর্যায়ে প্রণীত কতিপয় সুপারিশ

- উপবৃত্তি ১০০% করা এবং দুর্নীতিমুক্ত উপবৃত্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক নির্যাতন বন্ধ করা;
- কো-কারি কুলাম সহ কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা বাড়ানো ;
- অভিভাবক সভা নিয়মিত করা;
- পিটিএ ও মা-সমাবেশ নিয়মিত করা;
- শিশুবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা;
- ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের দূরত্ব কমানো;
- নিরক্ষর মা বাবা ও অভিভাবককে উৎসাহিত ও সচেতন করা;
- স্কুলগুলোতে খেলাধুলাসহ বিনোদনমূলক সরঞ্জাম এর ব্যবস্থা করা;
- আনন্দময় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা;
- পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষার উপকরণ বাড়ানো;
- ঝরে পড়া রোধ করা ও শিক্ষা সমাপনের প্রভাব সম্পর্কিত বিষয় যা মানুষ সহজেই বুঝতে পারে তা নিয়ে তৃর্ণমূল পর্যায়ে আলোচনা ও মতবিনিময় বেশি বেশি করা;
- নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা
- সুবিধাবঞ্চিতদের সাক্ষরতার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ;
- ঝরে পড়া ও কর্মজীবী শিশুদের জন্য বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা;
- শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ;
- বিদ্যালয় স্থাপনে দ্বৈততা নিরসনের ব্যবস্থা করা;
- বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বা অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান নানা বৈষম্য দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমে এক ও অভিন্ন পাঠ্যক্রম চালু করা;

- সাক্ষরতা প্রসারের লক্ষ্যে নৈশ বিদ্যালয় চালু করা;
- ক্লাস্টারভিত্তিক মা সমাবেশ ও র‍্যালির আয়োজন;
- ইউনিয়ন শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটিকে কার্যকর করা;
- শিক্ষা সপ্তাহ পালন করা;
- বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কমিউনিটি সভার আয়োজন ;
- মনিটরিং ব্যবস্থা আরো জোরদার এবং রোধে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- বাল্য বিবাহ-এর সাথে ঝরে পড়ার সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে।

বাল্যবিবাহ বন্ধে স্কুল পর্যায়ে সংঘটিত বাল্যবিবাহ-এর ঘটনা রিপোর্টিং ও রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

- সাধারণ মানুষের সচেতনতার জন্য নিয়মিতভাবে ধারাবাহিক ক্যাম্পেইন প্রয়োজন;
- নারীনেত্রীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় উঠান বৈঠক করার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারলে ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেতে পারে।

অর্জন

- র‍্যালীতে ব্যবহৃত শ্লোগানসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে;
- প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ঝরে পড়া রোধে ভূমিকা রাখবেন বলে অভিভাবকবৃন্দ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন;
- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ঝরে পড়া রোধে অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন;
- জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস পাওয়া গেছে ;
- প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং ঝরে পড়ার কারণ প্রতিবেদন আকারে সংরক্ষণ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন;
- এসএমসি-র সদস্যরা মাসিক সভায় বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন;
- নিজের ছেলে অথবা মেয়েকে স্কুলে যাওয়ার বয়স হলে অবশ্যই স্কুলে পাঠানোর কথা অঙ্গীকার করেন;
- শুধু নিজের নয় পাড়া-প্রতিবেশীর স্কুলে যাওয়ার উপযোগী ছেলে অথবা মেয়ে থাকলে তাকেও স্কুলে পাঠানোর জন্য উৎসাহিত করবেন।
- স্কুলে পাঠানোর পর প্রতিদিন যাতে তারা স্কুলে যায় সেদিকে নজর রাখবেন।
- ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খবর নেবেন।
- মাঝে মাঝে স্কুলের শিক্ষকদের সাথে ছেলেমেয়ের পড়াশুনা নিয়ে খোঁজ-খবর নিবেন।

শিশুদের স্কুলে শতভাগ ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ ও প্রাথমিক শিক্ষায় সমাপনের এই ক্যাম্পেইন উদযাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া এই ৩০ টি জেলায় 'সবার জন্য শিক্ষা'র অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। দেশের সর্বত্র শিক্ষা-সাক্ষরতার গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি শ্রমজীবী ও প্রতিবন্ধী শিশু, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও আদিবাসী শিশুসহ সকল শিশুর মানসম্মত শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্বারোপের ব্যাপারে জনসাধারণকে সচেতন করা হয়। দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্কুল-গমনোপযোগী শিশুকে স্কুলমুখী করতে না পারা, দরিদ্র শিশুদের ঝরে পড়া রোধে ব্যর্থতা, সমন্বিত শিক্ষা-নীতির অভাব, শিক্ষকদের জন্য একটি সম্মানজনক বেতন-কাঠামোর অবর্তমানতা ইত্যাকার যাবতীয় সমস্যা দূরীকরণের জন্য সকলকে উৎসাহিত ও সচেতন করে তোলা হয়েছে এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে। শিক্ষার আলোয় যাতে উদ্ভাসিত হতে পারে এ দেশের আপামর মানুষ, এজন্য সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বয়স্ক সাক্ষরতা ও বিশেষ শিক্ষার প্রয়াসকে সুপরিসর করার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এজন্য সরকারি নীতি এবং তা কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ সচেতন হবে এবং প্রচারণার মাধমে তৃর্ণমূল পর্যায়ের জনগণ শিক্ষা বিষয়ের নিজ নিজ সমস্যা বুঝতে পারবে এবং সেই সমস্যা সমাধান করতে উৎসাহিত হবে।

আবেদা সুলতানা
কার্যক্রম কর্মকর্তা, গণসাক্ষরতা অভিযান

জেডিসিতে পাসের হার বাড়লেও কমেছে জিপিএ ৫

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় পাসের হার বাড়লেও জিপিএ ৫ কমেছে। গত বছর জেডিসিতে পাসের হার ছিল ৯২ দশমিক ৪৬ শতাংশ। এবার তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯৩ দশমিক ৫ শতাংশে।

পাসের হার বাড়লেও জিপিএ ৫ প্রাপ্তিতে গত বছরের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। গত বছর জিপিএ ৫ পেয়েছিল ১৯ হাজার ২৯০ জন শিক্ষার্থী। এবার তা কমে হয়েছে ৮ হাজার ৭৬১ জন। জিপিএ ৫ প্রাপ্তি ৫৪ দশমিক ৫৮ শতাংশ কমেছে।

২০১৫ সালের ৩ লাখ ৪৩ হাজার ১৯০ জন জেডিসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আগের বছরের চেয়ে ৩১ হাজার ৬৫০ জন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২ হাজার ৭৮৪টি মাদ্রাসার শতভাগ পরীক্ষার্থী পাস করেছে।

২০টি মাদ্রাসার একজন পরীক্ষার্থীও পাস করেনি। পরীক্ষায় বিভিন্ন কারণে বহিস্কৃত হয় ১৫৯ জন। আগের বছরে শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৫৪৪টি।

মাদ্রাসায় মেয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ছেলেদের চেয়ে বেশি। ফলাফলেও ছাত্রীরা এগিয়ে। ১ লাখ ৬০ হাজার ৪১৩ ছাত্র পরীক্ষায় অংশ নেয়। পাসের হার ৯১ দশমিক ৯৬ ভাগ।

ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৮২ হাজার ৭৭৭ জন। পাসের হার ৯২ দশমিক ৯ শতাংশ। জিপিএ ৫ প্রাপ্তিতেও মেয়েরা এগিয়ে আছে। ৪ হাজার ২১৪ ছাত্র জিপিএ ৫ পেয়েছে আর ৪ হাজার ৫৪৭ জন ছাত্রী পেয়েছে পূর্ণ জিপিএ।

সমকাল ০১.০১.২০১৬

নতুন বছরে শিক্ষা নিয়ে বিশিষ্টজনের ভাবনা

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এই স্লোগান যথার্থ হবে শিশুদের সুশিক্ষায় গড়ে তুলতে পারলেই। আর এটা সম্ভব হবে মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতের মাধ্যমেই। নতুন শিক্ষাবর্ষে ভালো লেখাপড়া হবে এমন প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী গতকাল এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন।

শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের বিষয়ে হতাশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, শিক্ষা গবেষণায় বাজেটে বরাদ্দ মাইক্রোস্কোপ দিয়েও দেখা যাবে না। অথচ আমরা কৃষি গবেষণায় সামান্য বরাদ্দ দিয়েও পাটের জিন আবিষ্কারের মতো সফলতা পেয়েছি। তিনি বলেন, শিক্ষায় এমসিকিউ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, শিক্ষার মান উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে, ৮ম শ্রেণিতে মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ করার কথা বলা হচ্ছে- এসব করতে তো গবেষণার প্রয়োজন; কিন্তু সে মাপের গবেষক কই?

নতুন বছরে ভালো লেখাপড়ার প্রত্যাশা রেখে শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়েছেন জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ। গতকাল তিনি আমাদের সময়কে বলেন, শিক্ষা গবেষণায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। আমাদের শিক্ষানীতি আছে কিন্তু এ ক্ষেত্রে বরাদ্দ নেই। শিক্ষানীতি জাতীয় সংসদে পাস হলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না কেন? শিক্ষানীতিতে থাকা শিক্ষকদের মর্যাদার জায়গাটা গেল কোথায়? অথচ নীতিতে না থাকলেও প্রাথমিক পরীক্ষা ব্যবস্থা চলছেই। এতে প্রচুর অর্থও ব্যয় হচ্ছে। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে তিনি আরও বলেন, শিক্ষা খাতে ১৪ ভাগ বরাদ্দ বৃদ্ধি করুন। আর কথা না বলে তা বাস্তবায়ন করুন, তাহলেই দেশ লাভবান হবে।

আমাদের সময় ০১.০১.২০১৬

অর্থাভাবে তাড়াশ-রায়গঞ্জে আদিবাসীদের মাতৃভাষার ৭ বিদ্যালয় বন্ধ

তাড়াশ ও রায়গঞ্জে আদিবাসী শিশু শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের ৭টি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় আবারও অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। এতে মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দুটি উপজেলার ২ শতাধিক আদিবাসী শিশু শিক্ষার্থী।

২০০৯ সালে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মানুষের জন্য ফাউণ্ডেশন তাড়াশ ও রায়গঞ্জের বোয়ালপুকুর, খোদাবাড়ী, মানিকচাপর, ধলজান ও দেওঘরে ৫ বছরের শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগে মাতৃভাষার মাধ্যমে বাংলা শেখার জন্য ৭টি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মাতৃভাষার মাধ্যমে বাংলা শিখিয়ে আদিবাসী শিশু ছাত্রছাত্রীদের পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযুক্ত করে গড়ে তুলতেন। এতে প্রতি বছর দুই পর্বে বিভক্ত ৭টি বিদ্যালয়ে ২ শতাধিক আদিবাসী ছেলেমেয়ে তাদের মাতৃভাষা সাদরিতে শিক্ষা লাভের সুযোগ লাভ করে। মাতৃভাষা সাদরি জানার কারণে বাংলা কম জানায় আদিবাসী শিশুদের মধ্যে স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষার ভয়-ভীতি কাজ করত। এ কারণে আদিবাসী অধ্যুষিত তাড়াশ ও রায়গঞ্জে মানুষের জন্য ফাউণ্ডেশন ৩ বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আশ্রয় সাদরি ভাষার কারিকুলাম মোতাবেক বিদ্যালয়গুলোতে বই ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করত। কিন্তু এনজিওর সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলো প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার ফলে ২০১১ সালের ৩১ ডিসেম্বরে তা বন্ধ হয়ে যায়। এ-সংক্রান্ত একটি মানবিক প্রতিবেদন সমকালে প্রকাশের পর জার্মানি প্রবাসী সৈয়দ শাকিল ২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত স্থানীয় উড়াও ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে প্রায় ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে ৭টি স্কুল চালু রাখেন। ৩১ ডিসেম্বর পর তিনি নতুন করে অর্থ প্রদান না করার কথা জানিয়েছেন। ফলে আদিবাসী শিশু শিক্ষার্থীদের ৭টি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩১ ডিসেম্বর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রবাসী সৈয়দ শাকিল মোবাইল ফোনে জানান, তাদের প্রতিষ্ঠিত আশা ফাউণ্ডেশনের পক্ষে আর স্কুলগুলো চালু রাখা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে উড়াও ফাউণ্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক জগেন্দ্রনাথ টপ্পা বলেন, প্রবাসী সৈয়দ শাকিলকে বিদ্যালয়গুলো চালু রাখতে বিনীতভাবে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি তাতে রাজি হননি।

সমকাল ০২.০১.২০১৬

আগামী বছর থেকে প্রাথমিকের সব শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি

আগামী বছর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেবে সরকার। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান এ তথ্য জানিয়ে বলেছেন, বর্তমানে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর ৭০ শতাংশকে মাথাপিছু মাসিক একশ' টাকা করে উপবৃত্তি দেয়া হয়। মন্ত্রী বলেন, স্কুলগুলোর পরিচালনা পর্ষদে যারা থাকেন তারা সবাইকে উপবৃত্তি দিতে চান। এজন্য তারা স্কুলের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িয়ে দেখান। এতে দুটো সমস্যা হচ্ছে- প্রথমত, প্রকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা জানা যাচ্ছে না, আবার অতিরিক্ত বই ছাপতে হচ্ছে।

মঙ্গলবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে শিশু অধিকার বিষয়ক সংসদীয় ককাস (পিসিসিআর) ও সেভ দ্য চিলড্রেন আয়োজিত 'সবার জন্য প্রাথমিক

শিক্ষা অধিকার' শীর্ষক আলোচনা সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদের ডেপুটি স্পীকার ফজলে রাব্বী। আরও বক্তব্য রাখেন ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলাম, সংসদ সদস্য শামসুল আলম দুদু, আবুল কালাম আজাদ, হোসনে আরা লুৎফা ডালিয়া, উম্মে রাজিয়া কাজল, শিক্ষক নেতা কাজী ফারুক আহমেদ ও সেভ দ্য চিলড্রেনের কান্ট্রি ডিরেক্টর টীম হোয়াইট প্রমুখ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী। মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম উপবৃত্তির পরিমাণ বাড়াব। সবাইকে দেয়ার ইচ্ছেও ছিল প্রধানমন্ত্রীর। আবার আমরা ভুল হিসেবের মধ্যেও আছি। এজন্য আগামী বছর সবাইকে উপবৃত্তির আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় সরেজমিনে গিয়ে ৫ শতাংশ বেশি শিক্ষার্থী দেখানোর প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানান তিনি। বর্তমানে দেশে সরকারি ৬৩ হাজার ৪১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক কোটি ৪৬ লাখ ৭১ হাজার ৯১৪ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। তবে এ সংখ্যার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষায় কত শিক্ষার্থী আছে তা নিশ্চিত হতে এবার বই দেয়ার সময় শিক্ষার্থীদের ছবি তুলে রাখা হয়েছে।

পার্বত্য এলাকাসহ যেসব প্রত্যন্ত এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসব এলাকায় সরকার আবাসিক ব্যবস্থাসহ স্কুল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য মাতৃভাষায় বই ছাপার কাজও চলছে বলেও তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক উন্নতি হলেও প্রত্যাশার তুলনায় প্রাপ্তি আসেনি-এটা আমি মানি। তবে এজন্য আইন দরকার তা আমি মনে করি না। কারণ যেসব দেশে আইন হয়েছে তাদের তুলনায় আমাদের দেশে শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি বেশি, ঝরে পড়ার হারও কম। ডেপুটি স্পীকার ফজলে রাব্বী বলেন, আমাদের উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যাশার ফারাক থাকছে। তবে একথা মানতে হবে, আমরা অনেক এগিয়েছি, আরও এগোতে চাই। আপনারা (আয়োজকরা) একটি সুপারিশমালা দেন। জাতীয় সংসদ অবশ্যই সেটি ইতিবাচকভাবে দেখবে।

জনকণ্ঠ ১০.০১.২০১৬

ভুলে ভরা পাঠ্যবই নিয়ে সাংসদের ক্ষোভ

নিম্নমানের এবং ভুলে ভরা পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের দেওয়ায় সংসদে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্বতন্ত্র সাংসদ রুস্তম আলী ফরাজী। গতকাল বৃহস্পতিবার সংসদে অনির্ধারিত আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে নিম্নমানের ছাপা এবং ভুলে ভরা বইয়ের জন্য সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। ভুলে ভরা পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে জাতিকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

রুস্তম আলী এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের বিবৃতি দাবি করেন। তিনি বলেন, এর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। বছরের প্রথম দিনে হাতে বই পেয়ে শিক্ষার্থীরা খুশি। এক দিনে কোটি কোটি বই বিতরণে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে। কিন্তু যারা বই ছাপে, তাদের মধ্যে একটা কারসাজি রয়েছে। তারা নিম্নমানের বই ছাপিয়েছে। বই দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মলাট খুলে গেছে। তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধু কবে দেশে ফিরেছেন?' পঞ্চম শ্রেণির বইয়ে সালটা দিলেন একটা, তারিখ দিলেন আরেকটা। পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর মতো জাতীয় দায়িত্ব যাঁরা পালন করেছেন, তাঁদের এটা দেখে বাজারে ছাড়া উচিত ছিল।

অনির্ধারিত আলোচনার পর রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাব-সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা হয়। অধিবেশন ৩১ জানুয়ারি রোববার সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত মুলতবি করা হয়।

প্রথম আলো ২৯.০১.২০১৬

অদক্ষতায় থমকে শিশু শিক্ষার রস্ক প্রকল্প

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা প্রকল্প রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেনের (রস্ক) প্রায় ৪৮০ কোটি টাকা ফেরত যাচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, কিছু কর্মকর্তার অদক্ষতায় মুখ থুবড়ে পড়েছে প্রকল্পটি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ অর্ধেকের বেশি পার হয়েছে। কিন্তু অর্থ ব্যয় হয়েছে মাত্র ২৮ শতাংশ। রস্ক প্রকল্পের মধ্যম মেয়াদি ও ডিপিপি সংশোধনসংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে অর্থ ফেরতের বিষয়টি উঠে এসেছে। বৈঠকের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয়, এ প্রকল্পের মেয়াদে পুরো টাকা ব্যয় হবে না। ফলে ৫ থেকে ৬ কোটি মার্কিন ডলার অব্যয়িত থাকবে। প্রকল্পের মেয়াদে টাকা ব্যয় না হওয়ায় এ টাকা ফেরত যাবে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে রস্ক প্রকল্প পরিচালক ড. এম মিজানুর রহমান বলেন, এখনও এগুলো নিয়ে কাজ করছি। প্রকল্প উন্নয়নসংক্রান্ত সংশোধন (আরডিপিপি) হলে বোঝা যাবে কোন খাতে কত টাকা প্রয়োজন হচ্ছে। আদৌ কোনো টাকা ফেরত যাবে কিনা বা আরও টাকার প্রয়োজন হবে কিনা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এ বিপুল অর্থ ফেরত ঠেকাতে নতুন করে কার্যপরিকল্পনা চাওয়া হয়েছে রস্ক ইউনিট ও বাস্তবায়ন সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে গঠিত কমিটির কাছে। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় কিছু নতুন উপজেলা যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিশেষ করে দুর্গম অঞ্চল, হাওর, চর অঞ্চল, চা বাগান, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পাশাপাশি যেখানে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু ও ঝরে পড়ার হার বেশি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা যাবে না ওই সব এলাকাও যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নতুন উপজেলাগুলোতে সর্বোচ্চ ৫০টি শিখন কেন্দ্র স্থাপন, বিভাগীয় শহর ও বড় সিটি করপোরেশনের বস্তিগুলোতে আনন্দ স্কুল স্থাপন করার কথা বলা হয়। ২০১২ সালের ২ অক্টোবর বিশ্বব্যাংক রস্ক প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের অনুমোদন দেয়। ২০১৭ সালে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। মূলত উপকূল এলাকাসহ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের স্কুলে শিক্ষাদান করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

প্রকল্প থেকে টাকা ফেরত গেলে দাতাসংস্থার নেতিবাচক ধারণা হবে। এ কারণে প্রকল্পের টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে এ ব্যয় কতটুকু গুণগত হবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কারণ প্রকল্পের ব্যয় বাড়ানোর তালিকার মধ্যে রয়েছে প্রকল্পের অর্থায়নে পরিচালিত স্কুলগুলোর শিক্ষকদের বেতন ও ইনসেনটিভ বৃদ্ধি, প্রকল্প পরিচালনার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, প্রকল্পের আওতায় নতুন উপজেলা সংযোগ, ঢাকা মহানগরী ছাড়াও গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও বিভাগীয় শহরের বস্তি এলাকায় শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করে এ অর্থ ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

বৈঠকের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয়, শিশু শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম ৯০ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। তবে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তির পর আবার ঝরে পড়েছে। এ ছাড়া মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেছে অনেক শিখন কেন্দ্র। ফলে ভর্তি হওয়া শিশুরা প্রত্যেকেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ব শেষ করতে পারছে না। বৈঠকে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা যাতে পাঠ অব্যাহত রাখতে পারে এবং পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ পায় সে ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়ার কথা বলা হয়।

আলোকিত বাংলাদেশ ৩০.০১.২০১৬

এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট- ২০১৪ অবহিতকরণ সেমিনার

গণসাসাক্ষরতা অভিযান ও সুরভি-এর যৌথ উদ্যোগে ৬ জানুয়ারি ২০১৬ সকাল ১০:০০ টায় নারায়ণগঞ্জ জেলার জেলা প্রসাশকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে An Assessment of Primary Education Completion Examination in Bangladesh (প্রাথমিক শিক্ষার সমাপনী পরীক্ষা কোন পথে?) শীর্ষক এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট-২০১৪ এর অবহিতকরণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্টের ১৩তম (২০১৪) গবেষণা। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সুরভি-র এরিয়া ম্যানেজার জনাব মো: মাহমুদুর রহমান। এডুকেশন ওয়াচের ২০১৪ সমীক্ষার নীতি সংক্রান্ত সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক জনাব কে. এম. এনামুল হক। এই সেমিনারে জেলা শিক্ষা ও উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা সহ, স্থানীয় পর্যায়ের পর্যায়ের এনজিও, শিক্ষক, শিক্ষক সংগঠন, সাংবাদিক, শিক্ষার্থী স্থানীয় সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিসহ ১২০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

অবহিতকরণ সেমিনারে প্রধান অতিথি নারায়ণগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক মো: আনিছুর রহমান মিঞা এ ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য অভিযানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বাড়াতে হবে। একই সাথে সরকারের মনিটরিং ব্যবস্থা আরো জোরদার করতে হবে।

সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত এডুকেশন ওয়াচের এডভাইজরী বোর্ডের সম্মানিত সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইরেজী বিভাগের অধ্যাপক শফি আহমেদ বলেন, আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যে শিক্ষার্থীরা বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন তাদের ওপর বেশি নজর দেন এবং এতে করে অন্যান্যরা তাদের থেকে পিছিয়ে পড়ে। এছাড়া শিক্ষানীতিতে ৫ম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষার কথা উল্লেখ নেই।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, নারায়ণগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব শাহীন আরা বেগম।

সভার শেষ পর্যায়ে মুক্ত আলোচনায় কয়েকজন অভিভাবক কিছু সুপারিশমালা প্রণয়ন করেন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মো: গাউছুল আজম, জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সৈয়দা মাহফুজা বেগম ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব আফরোজা আক্তার চৌধুরী।

জয়া সরকার

প্রত্যাশা প্রকল্পের সক্ষমতা বিকাশী কার্যক্রম-এর পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত

২৭-২৮ জানুয়ারি ২০১৬, গণসাক্ষরতা অভিযান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রত্যাশা প্রকল্পের সক্ষমতা বিকাশী কার্যক্রম -এর একটি পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভার উদ্বোধন ঘোষণা করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক জনাব তপন কুমার দাশ। তিনি সভা আয়োজনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। পরিকল্পনা সভাটি দুইদিন ব্যাপী বিভিন্ন সেশনে বিভক্ত ছিল। সভার শুরুতেই অংশগ্রহণকারীবৃন্দ কিছু প্রত্যাশা উল্লেখ করেন।

- কার্যকরী কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি।
- প্রত্যাশা প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত ও আগামী বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা।

প্রত্যাশা প্রকল্পের সক্ষমতা বিকাশী নতুন ৪টি কার্যক্রম নিয়ে দলীয়ভাবে স্টেশন পদ্ধতিতে একটি সেশন পরিচালিত হয়। সভার দ্বিতীয় দিন এ সকালের সেশনে ঠিক প্রথম দিনের মত দলীয় আলোচনা করা হয় সমক্ষমতা বিকাশী নতুন ৩টি কার্যক্রম। ২য় দিন মধ্যাহ্ন বিরতির পরে বিভিন্ন কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় কোন সংস্থা, কোন কোয়ার্টার-এ, কোন কাজটি করবেন এর পাশাপাশি কার্যক্রম শেষ করে কিভাবে প্রতিবেদন তৈরি করবেন তারও একটি ফরমেট নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মোঃ মেহেদী হাসান

জেন্ডার গাইডলাইন শেয়ারিং শীর্ষক মতবিনিময় সভা

গণসাক্ষরতা অভিযান অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে একটি 'জেন্ডার গাইডলাইন' প্রণয়ন করেছে এবং ইতোমধ্যে গাইডলাইনটি নিয়ে এনসিটিবিসহ শিক্ষা ও সচেতনতা উপকরণ উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি ও কমিউনিটি রেডিও'র প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও স্পীড ট্রাস্ট-এর যৌথ উদ্যোগে ২৭-২৮ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ বরিশাল জেলায় কর্মরত জেন্ডার ও উপকরণ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় 'জেন্ডার গাইডলাইন শেয়ারিং' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা। সভায় বরিশাল বিভাগে কর্মরত বেসরকারি

উন্নয়ন সংস্থার শিক্ষা ও সচেতনতা উপকরণ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি, কমিউনিটি রেডিও প্রতিনিধি ও সংবাদকর্মীসহ ২৭ জন অংশগ্রহণ করেন।

সভায় সহায়ক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জনাব রাশেদা বেগম ও সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব উম্মে সালমা, বরিশাল।

সভায় অংশগ্রহণকারীগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে উপকরণ উন্নয়ন ও ব্যবহারে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে করণীয় বিষয় চিহ্নিত করেন। তাদের সংগঠনে জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবেশ উন্নয়নে চিহ্নিত কাজের উপর সংস্থাভিত্তিক কর্মপরিকল্পনাও প্রণয়ন করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সামসুল ইসলাম দিপু, হেড অব মিশন, স্পিড ট্রাস্ট, বরিশাল। তিনি স্থানীয় সংগঠনের জন্য উপকরণ উন্নয়ন ও ব্যবহার সংশ্লিষ্ট এ ধরনের সভা আয়োজন করায় গণসাক্ষরতা অভিযানকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সম-সুযোগ তৈরিতে মাঠ পর্যায় থেকে সকল কাজে ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবেশ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

মিজানুর রহমান আখন্দ

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষার মূলধারায় প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্পৃক্তি বিষয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান সিডিডি'র সহযোগিতায় সাভারে সিডিডি'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২৬ থেকে ২৮ জানুয়ারি ২০১৬ 'প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ' বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করে। এই প্রশিক্ষণে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মোট ১৫ জন শিক্ষক অংশ নেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতার পরিচিতি ও প্রাথমিক সনাক্তকরণ, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ উপযোগীকরণ ও ব্যবস্থাপনা,

শ্রেণীকক্ষে যোগাযোগ করার কৌশল, প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী শিক্ষাদান কৌশল, শিক্ষা উপকরণ ও পরীক্ষা পদ্ধতি নির্বাচন, একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে শিক্ষকের করণীয়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সনদ ও নীতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সাম্বনা আইউব

কাউন্সিল সভা

২৫ জানুয়ারি ২০১৬, সোমবার, বিকেল ৩:০০ টায় গণসাক্ষরতা অভিযান-এর কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অভিযান কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর সভাপতি জনাব কাজী রফিকুল আলম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আরমা দত্ত (ভাইস চেয়ার, গণসাক্ষরতা অভিযান ও নির্বাহী পরিচালক প্রিপ ট্রাস্ট), জনাব জ্যোতি এফ গমেজ (উপদেষ্টা, গণসাক্ষরতা অভিযান), জনাব সামসে আরা হাসান (গণসাহায্য সংস্থা) জনাব শিশির রোজারিও, (কারিতাস বাংলাদেশ), জনাব সালিমা রহমান (নির্বাহী পরিচালক, আরডিআরএস), জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ (পরিচালক, গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা), জনাব গোলাম মোস্তফা দুলাল (গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র), জনাব বজলে মোস্তফা রাজী (এসোসিয়েট ডিরেক্টর, এফআইভিডিবি), খন্দকার আরিফুল ইসলাম (সাইট সেভার্স), জনাব আবু তাহের (নির্বাহী পরিচালক, সুরভি) এবং জনাব রাশেদা কে. চৌধূরী (নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান)।

সভার অলোচ্যসূচির ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয় ও সর্বসম্মতিক্রমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর আগামী ১০, ১৭ অথবা ৩০ এপ্রিল ২০১৬ অভিযান-এর উনিশতম বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। ২০১৬ সালে অভিযান-এর ২৫ বছর (রজত জয়ন্তী) উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি পালন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জয়া সরকার

শিশুর শিক্ষার অধিকারঃ রাষ্ট্রের করণীয়

শিশু অধিকার সনদ (CRC)

অনুচ্ছেদ-২৮

১. অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র সমান সুযোগের ভিত্তিতে শিশুর শিক্ষা লাভের আধিকারকে স্বীকার করবে এবং এই অধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, বিশেষ করেঃ

ক) সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং সহজলভ্য করতে হবে।

খ) সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষাকে উৎসাহ দিতে হবে, প্রতিটি শিশুর জন্য এইরূপ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সকল শিশু যেন এ সুযোগ লাভ করতে পারে সে জন্য বিনা খরচে শিক্ষা লাভ ও প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ যাতে সবাই পায় সেজন্য সকল যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) শিক্ষা বিষয়ক ও বৃত্তিমূলক তথ্য এবং দিক নির্দেশনা সব শিশুর জন্য সুলভ ও পর্যাপ্ত হতে হবে।

ঙ) বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি উৎসাহিত করা এবং স্কুল ত্যাগের হার কমানোর লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ- ২৯

১. অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখবে তা হচ্ছেঃ

ক) শিশুর ব্যক্তিত্ব, মেধা এবং মানসিক ও শারীরিক দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ।

খ) মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা এবং জাতিসংঘ ঘোষিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ।

গ) শিশুর পিতামাতার নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং যে দেশে বাস করে সে দেশের মূল্যবোধ, শিশুর নিজস্ব মাতৃভূমিসহ অপরাপর সভ্যতার প্রতি সম্মানবোধকে জাগিয়ে তোলা।

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৬০ মাঘ ১৪২২ জানুয়ারি ২০১৬

সম্পাদক

দু' হাজার ষোল সালের বর্ষশুরুর বিন্দুতে অবধারিতভাবেই মনে পড়ে যাচ্ছে, বিগত দু'বছরের এমন জানুয়ারির কথা। পর পর দু'বছর আমরা বিভীষিকাময় ভয়বিহ্বল জানুয়ারি কাটিয়ে এসেছি। শুধু জানুয়ারি নয়, বাস্তবিক পক্ষে তার পরের আরও দু'মাসও ওই ভয়, অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা এবং অন্ধকারময়তা আমাদের জীবনকে ঘিরে ছিল। বাতাসে যখন-তখন বারুদের গন্ধ, অসহায় গণপরিবহনের যাত্রীদের ওপর পেট্রোল বোমার আক্রমণ, মেডিক্যাল কলেজের অসহ্য গা-শিউরে ওঠা দৃশ্য, শহর ও গ্রাম, সকল জনপদে হিংসা ও হানাহানির দৃশ্য আমাদের বাংলাদেশে।

যেকথাটা বিশেষভাবে মনে পড়ে, ওই সময়কালের মধ্যেই আমাদের কিশোর-কিশোরী শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক এবং উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ের চূড়ান্ত পরীক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিক্রম করেছে। সন্ধ্যায় পড়ার সময় আকস্মিক বোমার শব্দ, স্কুলে যাবার পথে যানবাহনে অগ্নিসংযোগ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে বার বার পরীক্ষার দিন এবং সময়ের পরিবর্তন এমন কমবয়সী পরীক্ষার্থীদের প্রকৃতপক্ষে জীবনের কঠিনতর পরীক্ষার মুখোমুখি হতে বাধ্য করেছিল। শিক্ষা ও মনোবৈজ্ঞানিক দিক থেকে শিক্ষার্থীদের জন্য তা যে বিপুল ক্ষতি বয়ে এনেছিল, সেকথা আন্দোলনকারীরা মনে রাখেন না। ওরা, ওদের অভিভাবকবৃন্দ এবং প্রকৃতপক্ষে দেশের সকল শান্তিকামী মানুষ বিগত দু'বছরের শুরুর পর থেকে প্রায় মাস তিনেক সমাজে চলমান অসুস্থ রাজনীতির কাছে অসহায় জিম্মি হয়ে পড়েছিলাম। এমন জানুয়ারি অথবা এমন কোন সময় আর আমরা দেখতে চাই না।

রাজনীতির ওই হিংসাশ্রয়ী রূপ এক পর্যায়ে নিস্তেজ হয়ে এলেও সমগ্র সমাজে অসহিষ্ণুতার রেশ কিন্তু কাটেনি, সম্ভবত নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। যে বিষয়টা আমাদের বিশেষভাবে পীড়িত ও উদ্বিগ্ন করেছে, তা হল দেশের নানা প্রান্তে শিশু হত্যা ও নির্যাতন। এই বাংলাদেশ আমরা আর কোন দিন প্রত্যক্ষ করিনি। দিনের পর দিন সংবাদপত্রের পাতায় ছবি দেখেছি নিখোঁজ শিশুশিক্ষার্থীর লাশের। স্কুল ছাত্র-ছাত্রী এবং পড়ুয়া নয় অথবা ঝরে পড়া এমন শিশুদের মৃত্যু বা হত্যা একথাই প্রমাণ করে যে, আমাদের সমাজ থেকে মৌলিক মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে। শিশুরা নিজেরাও সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ছে। এর কোন আশু প্রতিকার আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু এই প্রবণতাকে তো প্রতিরোধ করতেই হবে, না হলে সমাজটা দিনের পর দিন আরো ভঙ্গুর হয়ে উঠবে। আরও স্বল্প বিরতিতে ধমনীতে কাঁপন-ধরানো সব সংবাদ সৃষ্টি হতে থাকবে। আমাদের এই ক্রমচলমান দুঃসময়ে শুধু বাংলাদেশের ক্রিকেট দল ২০১৫ সালে থেকে থেকে দু'দণ্ডের আনন্দ দিয়েছে, নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত সমাজটার একটা ঐক্যবদ্ধ রূপ যে থাকতে পারে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে যখন ক্রিকেটের মাঠে সাফল্য পেয়েছি। নতুন বছরের শুরুতে তাদের জন্য, দেশের সকলের জন্য কল্যাণ কামনা করি আমরা।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, ১৬৫, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত

সম্পাদকীয় যোগাযোগ● ফোন: ৫৮১৫৩৪১৭, ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org